



# এবং হিমুঃ . . .

তুমায়ন আহমেদ



ରାତ ଏକଟା ।

ଆମାର ଜନ୍ୟେ ଏମନ କୋନ ରାତ ନା — ବଲା ଯେତେ ପାରେ ରଜନୀର ଶୁରୁ । The night has only started. କିନ୍ତୁ ଢାକା ଶହରେର ମାନୁଷଗୁଲି ଆମାର ମତ ନା । ରାତ ଏକଟା ତାଦେର କାହେ ଅନେକ ରାତ । ବେଶିର ଭାଗ ମାନୁଷଙ୍କ ଶୁଯେ ପଡ଼େଛେ । ଯାଦେର ସାମନେ SSC, HSC ବା ଏ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ତାରା ବିଷ ସାମନେ ନିଯେ ଥିଲୁଛେ । ନବ ବିବାହିତଦେର କଥା ଆଲାଦା — ତାରା ଜୈଗି ଆଛେ । ଏକେ ଅନ୍ୟକେ ନାନାନ ଭଦ୍ରିମାୟ ଅଭିଭୂତ ଫରାବ ଚେଷ୍ଟା କରଛେ ।

ଆମି ହାଁଟିଛି । ବଲା ଯେତେ ପାରେ ହନ ହନ କରେ ହାଁଟିଛି । ନିଶି ରାତେ ସବାଇ ଦ୍ରୁତ ହାଁଟେ । ଶୁଧୁ ପଶୁରା ହାଁଟେ ମୁହଁ ପାଯେ । ତବେ ଆମାର ହନ ହନ କରେ ହାଁଟାର ପେଛନେ ଏକଟା କାରଣ ଆଛେ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖିଦେ ପେଯେଛେ । କିଛୁ ହୋଟେଲ-ରେସ୍ଟୁରେନ୍ ଏଖନୋ ଖୋଲା । କଢକଡ଼ା ଭାତ, ଟକ ହେଁ ଯାଓୟା ବିରିଯାନୀ ହ୍ୟାତବା ପାଓୟା ଯାବେ । ତବେ ଖେତେ ହେଁ ନଗଦ ପଯସାଯ । ନିଶିରାତରେ ଖଦ୍ଦେରକେ କୋନ ହୋଟେଲଓୟାଲା ବିନା ପଯସାଯ ଖାଓୟା ନା । ଆମାର ସମସ୍ୟା ହଛେ, ଆମାର ଗାୟେ ସେ ପାଞ୍ଜାବି ତାତେ କୋନ ପକେଟ ନେଇ । ପକେଟ ନେଇ ବଲେଇ ମାନିବ୍ୟାଗଓ ନେଇ । ପକେଟହିନ ଏହି ପାଞ୍ଜାବି ଆମାକେ ରାପା କିମେ ଦିଯେଛେ । ଖୁବ ବାହାରୀ ଜିନିଶ । ପିଓର ସିଙ୍କ । ଖୋଲା ଗଲା, ଗଲାର କାହେ ସୃଷ୍ଟି ସୃତାର କାଜ । ସମସ୍ୟା ଏକଟାଇ — ପକେଟ ନେଇ । ପାଞ୍ଜାବିର ଏହି ବିରାଟ କ୍ରଟିର ଦିକେ ରାପାର ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାତେଇ ସେ ବଲଲ, ପକେଟେର ତୋମାର ଦରକାର କି !

କୁପବତ୍ତି ମେଯେଦେର ସବ ଯୁକ୍ତିଇ ଆମାର କାହେ ଖୁବ କଠିନ ଯୁକ୍ତି ବଲେ ମନେ ହୟ । କାଜେଇ ଆମିଓ ବଲଲାମ, ତାଇ ତୋ, ପକେଟେର ଦରକାର କି !

ରାପା ବଲଲ, ତୁମି ନିଜେକେ ମହାପୁରୁଷ ଟାଇପେର ଏକଜନ ଭାବ । ମହାପୁରୁଷଦେର ପୋଶାକ ହେଁ ବାହୁଳ୍ୟ ବର୍ଜିତ । ପକେଟ ବାହୁଳ୍ୟ ଛାଡ଼ା କିଛୁ ନା । ଆମି ଆବାରୋ ରାପାର ଯୁକ୍ତି ମେନେ ନିଯେ ହାସିମୁଖେ ନତୁନ ପାଞ୍ଜାବି ପରେ ବେର ହେଁଛି — ତାରପର ଥେକେ ନା ଖେଯେ ଆଛି । ସଖନ ପକେଟେ ଟାକା ଥାକେ ତଥନ ନାନାନ ଧରନେର ବନ୍ଧୁ-ବାନ୍ଧବେର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହୟ । ତାରା ଚାଖାଓୟାତେ ଚାଯ, ମିଙ୍ଗାଡ଼ା ଖାଓୟାତେ ଚାଯ । ଆଜ ଯେହେତୁ ପକେଟେଇ ନେଇ, କାଜେଇ ଏଖନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚିତ କାରୋ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହୟନି ।

ଆମାର ଶେଷ ଭରସା ବଡ଼ ଫୁପାର ବାସା । ରାତ ଦେଡ଼ଟାର ଦିକେ କଲିଥବେଲ ଟିପେ ତାଦେର ସୁମ ଭାଙ୍ଗାଲେ କି ନାଟକ ହେଁ ତା ଆଗେ-ଭାଗେ ବଲା ମୁଶକିଲ । ବଡ଼ ଫୁପା ତାଁର ବାଜିତେ

আমার যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। কাজেই আমাকে দেখে তিনি খুব আনন্দিত হবেন এ রকম মনে করার কোন কারণ নেই। সন্তানন শতকরা মাটি ভাগ যে, তিনি বাড়ির দরজা খুললেও গ্রীল খুলবেন না। গ্রীলের আড়াল থেকে হুংকার দেবেন — পেট আউট। গেট আউট। পাঁচ মিনিটের ভেতর ক্লিয়ার আউট হয়ে যাও, নয়ত বন্দুক বের করব।

বন্দুক বের করা তাঁর কথার কথা না। ঢাকার এডিশনাল আইজি তাঁর বন্ধুমানুষ। তাঁকে দিয়ে তিনি সম্প্রতি বন্দুকের একটা লাইসেন্স করিয়েছেন এবং আঠারো হাজার টাকা দিয়ে টুটু ঘোরের রাইফেল কিনেছেন। সেই রাইফেল তাঁর এখনো ব্যবহার করার সুযোগ হয়নি। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় আছেন।

বাকি থাকেন সুরমা ফুপু। সূর্যের চেয়ে বালি গরমের মত, বড় ফুপুর চেয়ে তিনি বেশি গরম। ঢাকার এডিশনাল আইজির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব থাকলে তিনি একটা মেশিনগানের লাইসেন্স নিয়ে ফেলতেন।

তবে ভরসার কথা — আজ বহুস্পতিবার। বহুস্পতিবারে বড় ফুপা খানিক মদ্যপান করেন। খুব আগ্রহ নিয়ে করেন, কিন্তু তাঁর পাকসুলী ইসলামীভাবাপন্ন বলে মদ সহ্য করে না। কিছুক্ষণ পর পর তাঁর বমি হতে থাকে। বড় বড় নিশ্চাস নিতে নিতে তিনি বলেন — I am a dead man. I am a dead man. ফুপু তাঁকে নিয়ে প্রায় সারারাতই ব্যস্ত থাকেন। এই অবস্থায় কলিংবলের শব্দ শুনলে তাঁরা কেউ দরজা খুলতে আসবেন না, আসবে বাদল। এবং সে একবার দরজা খুলে আমাকে ঢুকিয়ে ফেললে আব কোন সমস্যা হবার কথা না।

বড় ফুপার বাড়ির কাছাকাছি এসে টহল পুলিশের মুখ্যমুখি হয়ে গেলাম। তারা দলে চারজন। আগে দুজন দুজন করে টহলে বেরুত। ইদনীং বোধহয় দুজন করে বেরুতে সাহস পাচ্ছে না, চারজন করে বের হচ্ছে। আমাকে দেখেই তারা থমকে দাঁড়াল এবং এমন ভঙ্গি করল যেন পৃথিবীর সবচে বড় ক্রিমিন্যালকে পাওয়া গেছে। দলের একজন (সন্তুষ্ট সবচে) ভীতুজন, কারণ ভীতুবাই বেশি কথা বলে) চেঁচিয়ে বলল, “কে যায়? পরিচয়?”

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, আমি হিমু। আপনারা কেমন আছেন, ভাল?

পুলিশের পুরো দলটাই হকচকিয়ে গেল। খাকি পোশাক পরা মানুষদের সমস্যা হচ্ছে, কুশল জিঞ্জেস করলে এরা ভড়কে যায়। যে কোন ভড়কে যাওয়া প্রাণীর চেষ্টা থাকে অন্যকে ভড়কে দেয়ার। কাজেই পুলিশদের একজন আমার দিকে রাইফেল বাণিয়ে থবে কর্কশ গলায় বলল, পকেটে কি?

আমি আগের চেয়েও বিনয়ী গলায় বললাম, আমার পকেটেই নেই।

‘ফাঙ্গলামি করছিস? হারামজাদা! থাবড়া দিয়ে দাঁত ফেলে দেব?’

‘দাঁত ফেলতে চান ফেলবেন। পুলিশ এবং ডেনটিস্ট এরা দাঁত ফেলবে না তো কে ফেলবে। তবে দাঁত ফেলার আগে দয়া করে একটা পরীক্ষা করে দেখুন, সত্যিই পকেট

নেই।

একজন পরীক্ষা করার জন্যে এগিয়ে এল। সারা শরীর হাতাপিতা করে বিস্থয়ের সঙ্গে সঙ্গীদের একজনকে বলল, ওস্তাদ, আসলেই পকেট নাই।

যাকে ওস্তাদ বলা হয়েছে সে সন্তুষ্ট দলের প্রধান এবং সবচে ঝন্নী। সে বলল, মেয়েছেলের পাঞ্জাবি। এই হারামজাদা মেয়েছেলের পাঞ্জাবি পরে চলে এসেছে। মেয়েছেলের পাঞ্জাবির পকেট থাকে না। এই চল, থানায় চল।

আমি তৎক্ষণাত বললাম, ছিঁ চলুন। আপনারা কোন থানার আন্ডারে? রমনা থানা?

পুলিশের দলটা পুরোপুরি বিভাস্ত হয়ে গেলো। থানায় যাবার ব্যাপারে আমার মত আগ্রহী কোন আসামী তারা বোধহয় খুব বেশি পায় না।

‘কি নাম বললি?’

‘হিমু।’

‘যাস কই?’

‘ভাত খেতে যাই।’

‘রাত দেড়টায় ভাত খেতে যাস?’

‘ভাত সব সময় খাওয়া যায়।’

ওস্তাদ যাকে বলা হচ্ছে সেই ওস্তাদ এগিয়ে আসেছে। পেছন থেকে একজন বলল, ওস্তাদ, বাদ দেন। ড্রাগ-ফাগ খার আর কি। দুটা থাবড়া দিয়ে চলে আসেন।

ওস্তাদেরও মনে হয় সে রকমই ইচ্ছা। বলে কিক মারার আনন্দ এবং গালে থাবড়া মারার আনন্দ প্রায় কাছাকাছি। টহল পুলিশের ওস্তাদ এই আনন্দ থেকে বাস্তিত হবে কেন?

জোরালো একটা থাবড়া খেলাম। চোখে অঙ্ককার দেখার মত থাবড়া। যাথা বিষ যিম করে উঠল। ওরে খাইছেরে বলে চিকিৎসা দিতে গিয়েও দিলাম না। ওস্তাদ থাবড়া দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, আমি আস্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, আরেকটা থাবড়া দিয়ে যান, নয়ত থালে পড়ব। থালে পড়লে উপায় নাই, সাঁতার জানি না।

পুলিশের দল থেকে একজন বলল, ওস্তাদ, চলে আসেন।

স্পষ্টতই ওরা ঘাবড়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি ঘাবড়ে গেছেন ‘ওস্তাদ’। আমি বললাম, নিরীহ মানুষকে চড়-থাপড় দিয়ে চলে যাবেন এটা কেমন কথা?

ওস্তাদ দলের কাছে চলে যাচ্ছে। আমিও যাচ্ছি তার পেছনে পেছনে, যদিও উল্টো দিকে যাওয়াই নিয়ম। পুলিশের দল যেন কিছু হয়নি এই ভঙ্গিতে হাঁটা শুরু করেছে। আমি ওদের সঙ্গে কিছুটা দ্রব্য রেখে ইটাচি। তারা আমার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে রাস্তা ক্রস করল। আমিও রাস্তা ক্রস করলাম।

‘এই, তুই চাস কি?’

আমি আস্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, আরেকটা থাপড় দিয়ে দিন, বাসায় চলে যাই।

পুলিশের দল কিছু না বলে আবার হাঁটা শুরু করেছে। আমিও তাদের অনুসরণ করছি। মানুষের ভয় চক্রবৃক্ষিহাবে বাড়ে, এদেরও বাড়ে। চারজন পুলিশ, দু'জনের হাতে রাইফেল অথচ ওয়া এখন আতঙ্কে আধমরা। আমার মজাই লাগছে। আমি শিষ বাজানোর চেষ্টা করলাম — হচ্ছে না। ক্ষুধার্ত অবস্থায় শিষ বাজে না। পেটে ক্ষুধা নিয়ে গান গাওয়া যায়, শিষ বাজানো যায় না। তবু চেষ্টা করে যাচ্ছি — হিন্দী গানের একটা লাইন শিষে আমি ভালই আনতে পারি — হায় আপনা দিল তো আওয়ারা . . . আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে আছে . . .

শিষ দেবার কারণে ক্ষুধা একটু কম কম লাগছে। বড় ফুপার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। পুলিশের দল ছট করে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল।

আমি প্রায় দৌড়ে গলির মুখে গিয়ে বললাম, ভাইজান, আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। ফির মিলেছে। এরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। আমার সামান্য বাক্য দুটির মর্মার্থ নিয়ে তারা চিন্তা-ভাবনা করবে। আজকের রাতের টহল তাদের ভাল হবে না। আজ তারা ছায়া দেখে ভয় পাবে।

বিশ্বয়কর ব্যাপার হল — ফুপার বাড়ির প্রতিটি বাতি জ্বলছে। কোন একটা সমস্যা নিশ্চয়ই হয়েছে। আমি সেই সমস্যায় উপস্থিত হয়ে নিরিক্ষার ভঙ্গিতে বলব — ‘ভাত খাব’। সেই বলাটিও সমস্যা। আজ বোধহয় কপালে ভাত নেই। পুলিশের থাপড় খেয়েই রাত পার করতে হবে। আমি কলিংবেলে হাত রাখলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা খুলে গেল। বড় ফুপা তাঁর ফর্সা ছোটখাট মুখ বের করে ভীত চেখে আমার দিকে তাকালেন। পরক্ষণেই আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, আবে তুই? হিমু? আয় আয়, ভেতরে আয়। এই শোন, হিমু এসেছে, হিমু।

সিডিতে ধূপধাপ শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে সবাই এক সঙ্গে নেমে আসছে। কিছুক্ষণ আগে পুলিশকে ভড়কে দিয়ে এখন নিজেই ভড়কে যাচ্ছি।

গ্রীলের দরজা খুলতে খুলতে বড় ফুপা বললেন, কেমন আছিস রে হিমু?  
‘ভাল আছি।’

বাড়ির অন্যরাও চলে এসেছে। আঠারো-উনিশ বছরের একজন তরুণীকে দেখা যাচ্ছে। তরুণী এমনভাবে আমাকে দেখছে যেন আমি আসলে আগ্রার তাজমহল। হেঁটে মালিবাগে চলে এসেছি। ফুপা বললেন, হেন জ্বালানী নেই তোকে খোঁজা হয়নি। কোথায় ছিলি?

আমি নিরিক্ষার ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করলাম। নিরিক্ষার ভঙ্গি ঠিক ফুটল না। আমার জন্যে এই পরিবারটির প্রবল আগ্রহের আসল কারণটা না জানলে সহজ হওয়া যাচ্ছে না। সামাধিং ইঞ্জ রং, ভেরি রং। বাদল আবার ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। ওর কোন খোঁজ না পেয়ে আমাকে খোঁজা হচ্ছে, যদি আমি কোন সন্ধান বের করে দিই — এই হবে। এ ছাড়া আমার জন্যে এত ব্যস্ততার বিত্তীয় কোন কারণ

হতে পারে না। আমি এ বাড়ির নিষিদ্ধজন। শুধু আমি নির্যাক নই, আমার ছায়াও নির্যাক।

আমি ফুপুর দিকে তাকিয়ে বললাম, বাদল কোথায়? বাদলকে তো দেখছি না। শুয়ে পড়েছে?

ফুপু-ফুপু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। ফুপা বললেন, ও ঘরেই আছে।

‘অসুক-বিসুক?’

‘না। হিমু তুই বোস, তোর সঙ্গে কথা আছে। চা খাবি?’

‘চা অবশ্যই খাব, তবে ভাত-টাত খেয়ে তারপর খাব। ফুপু, রাতে রামা কি করেছেন? লেফট ওভার নিশ্চয় ডীপ ফ্রীজে রেখে দিয়েছেন?’

ফুপু গভীর গলায় বললেন, আব রামা-বামা! দুদিন ধরে ঘরে হাড়ি চড়েছে না।

‘ব্যাপারটা কি?’

ফুপু গলা পরিষ্কার করছেন। যেন অস্বস্তির কোন কথা বলতে যাচ্ছেন। ব্যাটারী চার্জ করে নিতে হচ্ছে।

‘বুঝলি হিমু, আমাদের উপর দিয়ে বিরাট বিপদ যাচ্ছে। হয়েছে কি, বাদল তার বন্ধুর বোনের বিয়েতে গিয়েছিল। এ বিয়ে খেতে গিয়েই কাল হয়েছে — গলায় কাঁটা ফুটেছে।’

‘খাসির রেজালা খেয়ে গলায় কাঁটা ফুটবে কি? গলায় হাড় ফুটতে পারে।’

‘কাঁটাই ফুটেছে। বেশি কায়দা করতে গিয়ে ওরা বাঙালী বিয়ের আয়োজন করেছে — মাছ ভাত, ডাল দৈ . . . ফাজিল আব কি, বেশি বেশি বাঙালী।’

‘বাদলের গলার সেই কাঁটা এখন আব বেরুচ্ছে না?’

‘না।’

‘ডাঙ্গুর দেখাননি?’

‘ডাঙ্গুর দেখাব না! বলিস কি? হেন ডাঙ্গুর নেই যাকে দেখানো হয়নি। আজ সকালেও একজন ই এন টি স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম — হা করিয়ে, চিমটা তুকিয়ে নানা কসরত করেছে। কাঁটা অনেক নিচে, চিমটা দিয়ে ধরতে পারছে না। দুদিন ধরে বাদল খাচ্ছে না, ঘুমুচ্ছে না। কি যে বিপদে পড়েছে!’

‘বিপদ তো বটেই।’

‘কাঁটা তোলার একটা দোয়া আছে ‘নিয়ামুল কোরানে’, এ দোয়াও তোর ফুপু এক লক্ষ চরিষ হাজার বাব পড়েছে। কিছুই বাদ নেই।’

‘বিড়ালের পায়ে ধরানো হয়েছে?’

তরুণী মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল। পরক্ষণেই শাড়ির আঁচল মুখে চেপে হাসি থামানোর চেষ্টা করল। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, হাসবে না। গ্রামবাংলার মানুষ গত পাঁচশ বছর ধরে কাঁটা ফুটলেই বিড়ালের পায়ে ধরছে। কাজেই এর একটা গুরুত্ব আছেই। কাঁটা হচ্ছে বিড়ালের খাদ্য। আমরা সেই খাদ্য খেয়ে বিড়ালের প্রতি

একটা অবিচার করছি, সেই জন্যে বিড়ালের পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা।

ফুপু খমখমে গলায় বললেন, বিড়ালের পায়েও ধরানো হয়েছে। সেও এক কেলেংকারি। বিড়াল খামচি দিয়ে রস্ত-টস্ত বের করে বিশ্রী কাণ্ড করেছে। এটিএস দিতে হয়েছে। এখন তুই একটা ব্যবস্থা করে দে।

‘আমি?’

‘হ্যাঁ। বাদলের ধারণা একমাত্র তুই-ই পারবি, আর কেউ পারবে না। তোর ফুপু ওকে কোলকাতায় নিয়ে যেতে চাচ্ছে। ও তোর সঙ্গে দেখা না করে যাবে না। হেন জাঙ্গলা নেই যে তোর খোঁজ করা হয়নি। তোকে হঠাৎ আসতে দেখে বুকে পানি এসেছে। দুটা দিন গেছে — ছেলে একটা-কিছু মুখে দেয়নি। আরো কয়েকদিন এরকম গেলে তো — মরে যাবে।’

ফুপুর কথা শেষ হবার আগেই বাদল ঘরে ঢুকল। চুল উসকু-খুসকু, চোখ বসে গেছে। ঠিকমত দাঁড়াতেও পারছে না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বললাম, খবর কি রে?

বাদল ফ্যাকাসে ভঙ্গিতে হাসল। সাহিত্যের ভাষায় এই হাসির নাম — ‘করুণ হাস্য’।

‘আমি বললাম, কিরে, শেষ পর্যন্ত মাছের হাতে পরাজিত?’

বাদল তার মুখ আরো করুণ করে ফেলল। আমি বললাম, বসে থাক, ব্যবস্থা করছি। গোসল-টোসল করে খাওয়া-দাওয়া করে নেই, তারপর তোর প্রবলেম ট্যাকল করছি।

বাদলের মুখ মুহূর্তের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে গেলো। তরুণী মেয়েটির ঠোঁটের কোনায় ব্যঙ্গের হাসির আভাস। তবে সে কিছু বলল না। এ বাড়ির পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ আমার অনুকূল। এ রকম অনুকূল আবহাওয়ার সুযোগ গ্রহণ না করা নিতান্তই অন্যায় হবে। আমি ফুপুর দিকে তাকিয়ে বললাম, গোসল করব। ফুপু, আপনার বাথকুমে হট ওয়াটারের ব্যবস্থা আছে না?

‘গীজার নষ্ট হয়ে গেছে। যাই হোক, পানি গরম করে দিছি। গোসল করে ফেল। গোসল করে ভাত খাবি তো?’

‘হ্যাঁ।’

‘তাহলে ভাত-টাত যা আছে গরম করতে দেই।’

‘ধরে কি পোলাওয়ের চাল আছে?’

‘আছে।’

‘তাহলে চট করে পোলাওয়ের কিছু চাল ঢিলিয়ে দিন। আলু ভাজা করুন। কুচি কুচি করে আলু কেটে ডুবা-তেলে কড়া করে ভাজা। গরম ভাত, আলু ভাজার সঙ্গে এক চামচ গাওয়া বি — খেতে একসেলেন্ট হবে। গাওয়া বি আছে তো?’

‘বি নেই।’

‘মাখন আছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘অল্প আঁচে মাখন ফুটাতে থাকেন। গাদ যেটা বের হবে ফেলে দেবেন — একেবারে এক নম্বর পাতে খাওয়া বি তৈরি হবে। কয়েকটা শুকনা মরিচ ভাজবেন — খিয়ের মধ্যেই ভাজবেন।’

‘বাদলের কাঁটাটার কিছু করা যাব কি-না দেখ।’

‘দেখব। সে দুদিন যখন অপেক্ষা করেছে আরো ঘণ্টাখানিক অপেক্ষা করতে পারবে। পারবি না বাদল?’

বাদল হ্যাঁ সুচক মাথা নাড়ল। মনে হচ্ছে কথা বলার মত অবস্থাও তার না।

আমি আরেকবার শিষ দিয়ে বাজালাম — হায় আপনা দিল . . .। তরুণী মেয়েটি আমার দিকে তাকাচ্ছে। তার চোখের দ্বিতীয় কেমন? ভাল না। সেই দ্বিতীয়ে কৌতুহল আছে। শুধু কৌতুহল না, অশুধু কৌতুহল। মেয়েটি একটা দৃশ্য দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে — চে. দৃশ্য হচ্ছে অতি চালাক একজন মানুষের গলায় দড়ি পড়ার মজাদার দৃশ্য। পুলিশদের মত এই মেয়েটাকেও ভড়কে দিতে পারলে ভাল লাগত, পারছি না। যেয়েরা পুলিশের মত এত সহজে ভড়কায় না। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার নাম কি?

‘ইরা।’

‘শোন ইরা, তোমার যদি কোন কাঁটার ব্যাপার থাকে, গলায় কাঁটা বা হাদয়ে কাঁটা তাহলে আমাকে বল, তোমার কাঁটার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব।’

ইরা কঠিন ভঙ্গিতে বলল, আমার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি গোসল করতে যান, আপনাকে গরম পানি দেয়া হয়েছে।

‘এত তাড়াতাড়ি তো পানি গরম হওয়ার কথা না।’

‘খাওয়ার জন্যে পানি ফুটানো হয়েছে। ঐ পানিই দেয়া হয়েছে।’

‘মেনি থ্যাংকস।’

আমি খেতে বসেছি। চেয়ারে বসেই বাদলকে ডাকলাম, বাদল খেতে আয়। বাদলের জন্যে একটা প্লেট দেখি।

ফুপু বললেন, ও তো ঠোকই গিলতে পারছে না। ভাত খাবে কি? তুই তো ওর ব্যাপারটা বুঝতেই পারছিস না।

আমি ফুপুকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ডাকলাম — বাদল আয়।

বাদল উঠে এল। আমার আদেশ অগ্রাহ্য করা সবার পক্ষেই সম্ভব। বাদলের পক্ষে না। আমি অন্য সবাইকে সবে যেতে বললাম। খাওয়ার সময় একগাদা লোক তাকিয়ে থাকলে খেয়ে আরাম পাই না। নিজেকে জামাই জামাই মনে হয়।

‘বাদল শোন, তোর পেটে খিদে, তুই খেয়ে যাবি। গলায় ব্যথা করবে — করুক।

কিছু যায় আসে না। আপাতত কিছু সময়ের জন্যে গলাটাকে পাঞ্চ দিবি না। কাঁটা থাকুক কাঁটার মত, তুই খাকবি তোর মত। বুবতে পারছিস?’  
‘হ্যাঁ।’

‘আরাম করে তুই আমার সঙ্গে ভাত খাবি। ভাত খাওয়ার পর আমরা মিষ্টি পান খাব। তারপর তোর কাঁটা নামানোর ব্যবস্থা করব।’

‘হিমু ভাই, আগে করলে হয় না।’

‘হয়। আগে করলেও হয় — তাতে কাঁটাটাকে শুরুত্ব দেয়া হয়। আমরা ফুলকে শুরুত্ব দেব — কাঁটাকে না। ঠিক না?’

‘ঠিক।’

‘আয়, খাওয়া শুরু করা যাক।’

বাদল ভাত মাখছে। আমি বললাম, শুরুনা মরিচ ভাল করে উলে নে — ঝালের চোটে নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে পানি বেরবে, তবেই না খেয়ে আরাম। শুরু করা যাক — রেডি সেট গো . . .

বাদল খাওয়া শুরু করল। কয়েক মন্দির খেয়েই হতভয় গলায় বলল, হিমু ভাই, কাঁটা চলে গেছে বলে মনে হচ্ছে!

‘চলে গেলে গেছে। এতে আকাশ থেকে পড়ার কি আছে? খাওয়া শেষ কর।’

‘ওদের খবরটা দিয়ে আসি?’

‘এটা এমন কোন বড় খবর না যে মাইক বাজিয়ে শহরে ঘোষণা দিতে হবে। আরাম করে খা তো। আলু ভাজিটা অসাধারণ হয়েছে না?’

‘অমৃত ভাজিয়ে যত লাগছে।’

‘যি দিয়ে চপচপ করে খা, ভাল লাগবে।’

‘আজ তুমি না এলে মরেই যেতাম। আমি সবাইকে বলেছি, হিমু ভাই-ই কেবল পারে এই কাঁটা দূর করতে। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না।’

‘মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু যায় আসে না। তোর নিজের বিশ্বাসটাই প্রধান।’

‘ইরা তো তোমাকে নিয়ে হাসাহসি করছিল।’

‘তাই না-কি?’

‘হ্যাঁ। আমি যখন বললাম, হিমু ভাই হচ্ছে মহাপুরুষ, তখন হাসতে সে প্রায় বিষম খাব। আজ তার একটা শিঙ্গা হবে।’

বাদলের চোখে পানি এসে গেছে। ঝালের কারণে চোখের পানি, না আনন্দের পানি সেটা বোৰা যাচ্ছে না।

একেক ধরনের চোখের পানি একেক রকম হওয়া উচিত ছিল। দুঃখের চোখের পানি হবে এক রকম, আনন্দের পানি অন্য রকম, আবার ঝালের অক্ষু আবেকে রকম। প্রকৃতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আবেগের ব্যবস্থা রেখেছে কিন্তু সব আবেগের প্রকাশ চোখের পানি দিয়ে সেবে ফেলেছে। ব্যাপারটা কি ঠিক হল?

দুঃখের চোখের পানি হবে নীল। দুঃখ যত বেশি হবে নীল রং হবে তত গাঢ়। রাগ এবং ক্রোধের অক্ষু হবে লাল। দুঃখ এবং রাগের মিলিত কারণে যে চোখের পানি তার রং হবে খয়েরি। নীল এবং লাল মিশে খয়েরি রঙই তো হয়?

কাঁটা শুক্রির যে আনন্দ এ বাড়িতে শুরু হল তার কাছে বিয়েবাড়ির আনন্দ কিছু না। ফুপু ছেলেকে জড়িয়ে ধরে মরাকান্না শুরু করলেন। বাদল যতহই বলে, কি যত্নণা! মা, আমাকে ছাড় তো। তিনি ততই শক্ত করে ছেলেকে জড়িয়ে ধরেন।

ফুপা আনন্দের চোটে তাঁর হুইম্পির বোতল খুলেছেন। আজ বহুস্মিন্তিবার। এমনিতেই তাঁর মদ্যপান দিবস। ছেলের সমন্বয় জন্যে খেতে পারছিলেন না। এখন ডবল চড়াবেন। ফুপা যে দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছেন সংস্কৃত কবিতা সেই দৃষ্টিকে বলেন “প্রেম-নয়ন”।

শুধু ইরার চোখ কঠিন। পাথরের চোখেও সামান্য তরল ভাব থাকে। তার চোখে তাও নেই।

রাতে ফুপার বাড়িতে থেকে গেলাম। আজ আমার থাকার জায়গা হল গেস্ট রুমে। এই বাড়ির গেস্ট রুম তালাবদ্ধ থাকে। বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর গেস্ট এলেই শুধু তালা খোলা হয়। আজ আমি বিশেষ শ্রেণীর একজন গেস্ট। স্মৃতে যাবার আগে আগে আমার জন্যে কফি চলে এল। এটিও বিশেষ ব্যবস্থার একটা অঙ্গ। কফি নিয়ে এল ইরা। ইরা সম্পর্কে এ পর্যন্ত তথ্য যা সংগৃহ করেছি তা হচ্ছে — মেয়েটা শামসুন্নাহর হলে থেকে পড়ে। তার অনার্স ফাইন্যাল পয়ীক্ষা। হলে পড়াশোনার সমস্যা হচ্ছে, তাই এ বাড়িতে চলে এসেছে।

ফুপার খালাতো ভাইয়ের বড় মেয়ে। দাক্ষণ নাকি ব্রিলিয়েন্ট। না পড়লেও না-কি ফাস্ট ফ্লাশ ফাস্ট হবে। তারপরেও পড়ছে, কারণ রেকর্ড মার্ক পেতে চায়।

ইরা কফির কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, আপনার ধারণা, আজ আপনি আপনার বিশেষ এক অলৌকিক ক্ষমতা দেখালেন?

আমি কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বললাম, তোমার সে রকম ধারণা না?

‘অবশ্যই না। বাদলের আপনার উপর অগাধ বিশ্বাস। আপনাকে দেখে সে রিলাক্সড বোধ করেছে। সহজ হয়েছে। ভয়ে-আতঙ্কে তার গলার মাংসপেশী শক্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই ভাবও দূর হয়েছে। তারপর আপনি তাকে ভাত খাওয়ালেন। সহজেই কাঁটা বের হয়ে এল, আমি কি ভুল বলছি?’

‘না, ভুল হবে কেন?’

‘নিতান্তই লৌকিক একটা ব্যাপার করে আপনি তাতে একটা অলৌকিক ফ্রেবার দিয়ে ফেলেছেন — এটা কি ঠিক হচ্ছে?’

‘আমি কোন ফ্রেবার দেইনি ইরা, এটা তুমি কল্পনা করছ।’

‘আপনি না দিলেও অন্যরা দিচ্ছে। বাদল দিচ্ছে। আপনার ফুপ্পা-ফুপ্প দিচ্ছেন।’

‘তাতে ক্ষতি তো হচ্ছে না। তোমার মত যারা বুদ্ধিমান তারা ঠিকই আসল ব্যাপারটা ধরতে পারছে।’

ইয়া কঠিন গলায় বলল, আমাদের সমাজে কিছু কিছু প্রতারক আছে, যারা হাত দেখে, গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করে, পাথর দেয়, মন্ত্র-তত্ত্ব পড়ে — আপনি কি তাদের চেয়ে আলাদা? আপনি আলাদা না, আপনি তাদের মতই একজন।

‘হতে পারে। কিন্তু তুমি আমার উপর এত রেগে আছ কেন?’

‘আপনি যে শুরু খেকেই আমাকে তুমি তুমি করে বলছেন — সেটাও আমার খারাপ লাগছে। আমি তো স্কুলে পড়া বাচ্চা মেয়ে না। আপনি আমাকে চেনেনও না। প্রথম দেখাতেই আপনি আমাকে তুমি বলবেন কেন?’

‘ভূল হয়েছে। একবার যখন বলে ফেলেছি সেটাই বহাল বাধি। মানুষ আপনি থেকে তুমিতে ঘায়। তুমি থেকে আপনিতে ঘায় না। নিয়ম ভাঙ্গা কি ঠিক হবে?’

‘আমার বেলায় নিয়মটা ভাঙলেই আমি খুশি হব।’

‘এখন থেকে আপনি করে বলব?’

‘ধন্যবাদ। আরেকটা কাজ কি দয়া করে করবেন?’

‘অবশ্যই করব। বলুন।’

‘বাদলকে ডেকে একটু কি বুঝিয়ে বলবেন তার গলার কাঁটাটা কি ভাবে গেল? ওর মন থেকে আধিভৌতিক ব্যাপারগুলি দূর করা দরকার। আপনি বুঝিয়ে বলে দিন। আমার বলায় সে কনভিন্ড হবে না। আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে আসি।’

‘ছি আছা, নিয়ে আসুন।’

ইয়া বাদলকে নিয়ে চুকল। আমি বললাম, বাদল, তুই স্থির হয়ে আমার সামনের চেয়ারটায় বোস। মিস ইয়া, আপনিও বসুন। তবে আপনাকে স্থির হয়ে না বসলেও চলবে। আপনি ইচ্ছ করলে নড়াচড়া করতে পারেন।

ইয়া তাকাচ্ছে তীব্র চোখে। আমি তার সেই চোখ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বাদলের দিকে তাকিয়ে বললাম, বাদল শোন, তুই যদি ভেবে থাকিস আমি আমার মহা ক্ষমতাবলে তোর গলার কাঁটা গলিয়ে ফেলেছি, তাহলে তুই বোকার স্বর্গে বাস করছিস। কি ভাবে সেই ঘটনা ঘটল তা ইয়া খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে দেবে। ব্যাখ্যা শুনে তারপর ঘূর্ণতে ঘাবি। তার আগে না। মনে থাকবে?

‘থাকবে।’

‘যা ভাগ।’

বাদল হাসিমুখে উঠে দাঢ়িয়েছে। ইয়া এখনো তীব্র চোখে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে সে খুব অপমানিত বোধ করছে। মেয়েটা সুন্দর। এরকম সুন্দর একটা মেয়ে ফিজিক্স পড়ছে কেন? ফিজিক্স পড়বে শুকনা রস কষহীন মেয়েগুলি। ইয়ার পড়া

উচিত ইংরেজি কিংবা বাংলা সাহিত্য।

আমি চাদর মৃড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ফোম বিছানো গদি — আরামের বিছানা। এত আরামের বিছানায় কি শুম আসবে?

‘হিমু জেগে আছিস?’

ফুপ্পার ডড়ানো গলা। ইতিমধ্যেই তিনি উচু তারে নিজেকে বেঁধে ফেলেছেন বলে মনে হচ্ছে। ফুপ্পাকে ঘরে ঢেকানো এখন বিপদজনক হবে। তিনি উচু থেকে উচুতে চড়তে থাকবেন, তারপর সেখান থেকে ধপাস করে নিচে নামবেন, বাধি করে ঘর ভাসাবেন।

‘হিমু, হিমু।’

‘ছি।’

‘তোর সঙ্গে কিছু গল্প শুভ করা যাক — য্যান টু য্যান টক। তুই আজ ভালই ভেঙ্গিক দেখালি। দরজা খোল। হিমু, হিমু।’

মাতাল দরজা খোলাতে চাইলে খুলিয়ে ছাড়বে। ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান করতেই থাকবে। কাঙ্গেই দরজা খুললাম। বড় ফুপা গ্লাস এবং বোতল হাতে ঢুকে পড়লেন।

‘তোর ফুপু ঘূমিয়ে পড়েছে। খুব টেনশনে গেছে তো, এখন আরামে শুমুচ্ছে। আমি ভাবলাম ‘কন্টক-মুক্তি’ সেলিব্রেট করা যাক। কন্টক-মুক্তি শব্দটা কেমন লাগছে?’

‘ভাল লাগছে।’

‘কন্টক মুক্তির ইংরেজী কি হবে? “Freedom from thorn?”

‘ফুপা আপনি দ্রুত চালাচ্ছেন। আমার মনে হয় এখন উচিত শুয়ে ঘূমিয়ে পড়া।’

‘তোর সঙ্গে গল্প করতে এসেছি। গল্প করতে ভাল লাগছে। আমার ধারণা তোর উপর ইনজাপ্সিচিস করা হয়েছে। তোকে যে আমি বা তোর ফুপু দেখতে পাবি না এটা অন্যায়। ঘোরতর অন্যায়। তোর অপরাধ কি? আমি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট ভেবেছি। তোর নেগেটিভ দিকগুলি কি —

এক, তোর চাকরি বাকরি নেই। এটা কোন ব্যাপার না, পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক আছে যাদের চাকরি নেই।

দুই, তুই পথে পথে ঘূরিস। এটা কোন অপরাধ হতে পারে না। এটা আপরাধ হলে পৃথিবীর সব পর্যটকরাই অপরাধী।

‘আর থাবেন না ফুপা।’

‘কথার মাঝখানে কথা বলিস না হিমু। আমি কি যেন বলছিলাম?’

‘পর্যটকদের সম্পর্কে কি যেন বলছিলেন।’

‘কোন পর্যটক? হিউয়েন সাং? হিউয়েন সাং এর কথা খামাখা বলব কেন?’

‘আর না খেলে হয় না ফুপা?’

‘হয়। হবে না কেন? তবে আনন্দ পরিপূর্ণ হয় না। হিউয়েন সাং-এর কথা কি

বলছিলাম ?'

'আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

'শোন হিমু, তুই লোক খারাপ না। এবং তোর ক্ষমতা আছে। বাদল যে তোর নাম  
বলতে অজ্ঞান হয়ে যায়, বাদলের কোন দোষ নেই। I Like You Himu.'

'থ্যুক ইউ ফুপা !'

'তোর একটাই অপরাধ তুই শুধু হাটিস। এই অপরাধ ক্ষমা করা যায়। হিউয়েন  
সাংওতো হেঁটেছে। এই দেখ আবার হিউয়েন সাং-এর কথা চলে এসেছে। বারবার এই  
নাক চ্যাপ্টা চাইনীজটার কথা কেন বলছি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ফুপা চোখ মুখ উল্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রাইলেন তারপর হড়হড় শব্দ হতে লাগল।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আমার কিছু করার নেই। ফুপা বিছানাতে বসেছিলেন।  
বিছানা এবং আমার শরীরের এক অংশ তিনি ভাসিয়ে ফেলেছেন। বিড় বিড় করে  
বলছেন, "I am a dead man, I am a dead man."



বদরুল সাহেব আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, কোথায় ছিলেন এতদিন ?

তাঁর গলা মোটা, শরীর মোটা, বুক্কি ও মোটা। আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি  
প্রশংস্ত মানুষের অন্তরও প্রশংস্ত হয়। বদরুল সাহেবের অন্তর প্রশংস্ত, মনে মায়াভাব  
প্রবল। আমি ছ'-সাত দিন ধরে মেসে আসছি না। কেউ হয়ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করেনি।  
তিনি ঠিকই লক্ষ্য করেছেন। আমাকে দেখে তিনি যে উল্লাসের ভঙ্গি করলেন সেই  
উল্লাসে কোন খাদ নেই।

'কোথায় ছিলেন রে ভাই ?'

আমি হাসলাম। অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর আমি ইদনীং হেসে দেবার চেষ্টা করছি।  
একেক ধরনের প্রশ্নের উত্তরে একেক ধরনের হাসি। এখন যে হাসি হাসলাম তার অর্থ  
হচ্ছে — আশেপাশেই ছিলাম।

বদরুল সাহেব বললেন, গত বহুস্পতিবারে মেসে ফিল্ট হল। বিবাট খাওয়া-  
দাওয়া। পোলাও, খাসির রেজালা সালাদ। খাসির মাংস আমি নিজে কিনে এনেছিলাম।  
একটা আন্ত খাসি দেখিয়ে বললাম, হাফ আমাকে দাও, নো হাংকি-পাংকি।

'হাফ দিয়েছিল ?'

'দিবে না মানে ? মাংস কেটে আমার সামনে পিস করতে চায়। আমি বললাম,  
খবর্দীর, আগে ওজন করে তারপর পিস করবে।'

'আগে পিস করলে অসুবিধা কি ?'

'আগে পিস করতে দিলে উপায় আছে? ফস করে বাজে গোসত মিঞ্জ করে  
ফেলবে। কিছু বুঝতেই পারবেন না। ম্যাজিক দেখিয়ে দেবে। খাসির গোশত কিনে নিয়ে  
রান্না করার পর খেতে গিয়ে বুঝবেন পাঁঠার গোশত। মিস্টার পাঁঠা !'

বদরুল সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা মেসের সিডিতে, তিনি বেরুচিলেন। আমাকে  
দেখে আমার পেছনে ঘরে এসে ঢুকলেন। ফিল্টের ব্যাপারটা না বলে তিনি শাস্তি  
পাবেন না। গোশত কেনা থেকে যে গল্প শুরু হয়েছে সেই গল্প শেষ হবে খাওয়া  
কিভাবে হল সেখানে। আমি শৈর্ষ নিয়ে গল্প শোনার প্রস্তুতি নিছি। খাওয়া-দাওয়ার যে  
কোন গল্পে ভদ্রলোকের অসীম আগ্রহ। এত আনন্দের সঙ্গে তিনি খাওয়ার গল্প করেন  
যেন এই পথিকী সৃষ্টিই হয়েছে খাওয়ার জন্যে। খাওয়া ছাড়াও যে গল্প করার আরো

বিষয় থাকতে পারে ভদ্রলোক তা জানেন না।

‘খুব চৰি হয়েছিল। গোশতের ভাজে ভাজে চৰি।’

‘বাহু, ভাল তো।’

‘চবিদার শোশত রাখা করা কিন্তু খুব ডিফিকালট। বাবুটি করে কি — যেহেতু চৰি বেশি, তেল দেয় কম। এটা খুব ভুল। চবিদার গোশতে তেল লাগে বেশি।’

‘জ্ঞানতাম না তো।’

‘অনেক ভাল ভাল বাবুটিই ব্যাপারটা জানে না। রাখা তো খুব সহজ ব্যাপার না। আমি নিজে বাবুটির পাশে বসে রাখা দেখিয়ে দিলাম।’

‘খেতে কেমন হয়েছিল?’

‘আমি নিজের মুখে কি বলব — আপনার জন্য রেখে দিয়েছি। চেখে দেখবেন।’

‘রেখে দিয়েছেন মানে? বহস্পতিবার ফিস্ট হয়েছে, আজ হল শনিবার।’

‘দুই বেলা গরম করেছি। নিজের হাতেই করেছি। অন্যের কাছে এইসব দিয়ে ভরসা পাওয়া যাবে না। ঠিকমত ঝুল দেবে না। মাংস টক হয়ে যাবে। বসুন, আমি নিয়ে আসছি।’

তিনি আনন্দিত মুখে গোশত আনতে গেলেন। আজ দিনটা মনে হয় ভালই যাবে। সকালে ভরপোর খেয়ে নিলে সারাদিন আর খাওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। বড় ফুপার বাসা থেকে ভোরবেলা বের হয়েছি। সবাই তখনো শুমে। কাজের মেয়েটা জেগে ছিল। সেই দুরজ্ঞ খুলে দিল। বেরিয়ে আসার সময় টুক করে এক কদম্বুসি। আমি বিশ্বিত হয়ে বললাম, ব্যাপার কি?

সে নিচু স্বরে বলল, খাস দিলে আফনে এটু দোয়া করবেন ভাইজান। আমার মাইয়াটা বহুত দিন হইছে নির্খোজ।

‘বল কি? কতদিন হয়েছে নির্খোজ?’

‘তা ধরেন গিয়া দুই বছর হইছে। এক বাড়িত কাম করত। এরা মাইর-ধইর করতো — একদিন বাড়ি থাইক্যা পালাইয়া গেছে। আর কোন খুইজ নাই।’

সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে যাদের বাস তাদের আবেগ-টাবেগ বোধহয় কম থাকে। দুবছর ধরে মেয়ে নির্খোজ এই সংবাদ সে দিছে সহজ গলায়। যেন তেমন কোন বড় ব্যাপার না।

‘নাম কি তোমার মেয়ের?’

‘লুৎফুল্লেসা। লুৎফা ডাকি।’

‘বয়স কত?’

‘ছোট মাইয়া, সাত-আট বছর। ভাইজান, আফনে এটু চেষ্টা নিলে মেয়েটারে ফিরত পাই। মেয়ে ঢাকা শহরেই আছে।’

‘জান কি করে ঢাকা শহরে আছে?’

‘আয়না পড়া দিয়া জানছি। ধনখালির পীর সাব আয়না পড়া দিয়া পাইছে। অখন

আফনে একটু চেষ্টা নিলে . . .’

‘আজ্ঞা দেখি।’

সে আবার একটা কদম্বুসি করে ফেলল।

সকালের শুরুটা হল কদম্বুসির মাধ্যমে। শুরু হিসেবে মদ না। সাধু-সম্মানীয়ের স্তরে পৌছে যাছি কি-না বুঝতে পারছি না। সাধু-সম্মানীয়ার পায়ের পরিত্র ধূলি বিতরণের মাধ্যমে সকাল শুরু করেন। তারপরের অংশে ভূরি ভোজন, ঘি, হালুয়া, পরোটা মাংস।

বদরুল সাহেব তাঁর বিখ্যাত খাসির গোশতের বাটি নিয়ে এসেছেন। গোশত বলে সেখানে কিছু নেই। জ্বালের চেটে সব গোশত গলে কালো রঙের ঘন স্ফুরের মত একটা বস্তু তেরি হয়েছে। চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলা যায়। তবে বদরুল সাহেবের বিবেচনা আছে। তিনি সঙ্গে চায়ের চামচ এনেছেন। আমি সেই চামচে তরল খাসির মাংস এক চুমুক মুখে দিয়ে ফেললাম, অসাধারণ! রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার আচ্ছাকাছি।

বদরুল সাহেব উজ্জ্বল মুখ করে বললেন, খাসি হওয়ায় টেস্ট আরো খুলেছে, তাই না? গোছতের ঐ মজা যত খাসি তত মজা। টেস্ট খুলেছে না?

‘খুলেছে বললে কম বলা হয়। একেবারে ডানা মেলে দিয়েছে।’

‘গরম গরম পরোটা দিয়ে খেলে আরো আরাম পেতেন। আপনি একটু ওয়েট করুন, আমি দৌড় দিয়ে দুটা পরোটা নিয়ে আসি। সাড়ে ছাঁটা বাজে, মোবারকের স্টলে পরোটা ভাজা শুরু করেছে।’

‘পরোটা আনার কোন দরকার নেই। আপনি আরাম করে বসুন তো। বরং এক কাজ করুন, আরেকটা চামচ নিয়ে আসুন, দুজনে মিলে মজা করে থাই।’

‘না না, অল্পই আছে।’

‘নিয়ে আসুন তো চামচ। ভাল জিনিস একা খেয়ে আরাম নেই।’

‘এটা একটা সত্য কথা বলেছেন।’

বদরুল সাহেব চামচ আনতে গেলেন। ভদ্রলোকের জন্যে আমার মায়া লাগছে। গত দু’মাস ধরে তাঁর কোন চাকরি নেই। ইনসুরেন্স কোম্পানীতে ভাল চাকরি করতেন। ইলিপেস্টের জাতীয় কিছু। কোম্পানী তারা তাকে ছাঁটাই করে দিয়েছে। এই বয়সের একজন মানুষের চাকরি চলে গেলে আবার চাকরি জোগাড় করা কঠিন। ভদ্রলোক কিছু জোগাড় করতে পারছেন না। মেসের ভাড়া তিন মাস বাকি পড়েছে। যতদূর জানি, মেসের খাওয়াও তাঁর বক্ষ। ফিস্টে তার নাম খাকার কথা না, বাজার-টাজার করে দিয়েছেন, রাখার সময় কাছে থেকেছেন এই বিশেষ কারণে হয়ত তাঁর খাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

চামচ নিয়ে এসে বদরুল সাহেব আরাম করে থাচ্ছেন। তাঁকে দেখে এই মুহূর্তে মনে

করার কোন কারণ নেই যে, পৃথিবীতে নানান ধরনের দুঃখ-কষ্ট আছে। যুদ্ধ চলছে বসনিয়ায়। কুমারজয় অকারণে একজন আবেকজনকে মারছে। তাঁর নিজের সমস্যাও নিশ্চয়ই অনেক। দুর্মাস বাড়িতে ঘনির্ভূত ঘায়নি। বাড়ির লোকজন নিশ্চয়ই আতঙ্কে অস্থির হচ্ছে। উদ্দলোক নিবিকার।

‘হিমু সাহেব !’

‘ছি !’

‘হাড়গুলি চুম্বে চুম্বে খান, মজা পাবেন। ইংরেজিতে একটা কথা আছে ‘Nearer the bone, sweeter is the meat.’

আমি একটা হাড় মুখে ফেলে চুম্বতে লাগলাম।

তিনিও একটা মুখে নিলেন। আনন্দে তাঁর চোখ প্রায় বক্ষ।

‘বদরুল সাহেব !’

‘ছি !’

‘চাকরি-বাকরির কিছু হল ?’

‘এখনো হয়নি, তবে ইনশাআর্থাত্ হবে। আমার অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনা। এদের বলেছি — এরা আশা দিয়েছে।’

‘শুধু আশার উপর ভরসা করাটা কি ঠিক হচ্ছে ?’

‘আমার খুব ক্লোজ একজনকে বলেছি। ইস্টার্ন গামেন্টস-এর মালিক। ইস্কুলে এক সঙ্গে পড়েছি। এখন রমরমা অবস্থা। গাড়ি-টাড়ি কিনে ছলসুল। বাড়ি করেছে গুলশানে।’

‘তিনি কি আশা দিয়েছেন ?’

‘পরে যোগাযোগ করতে বলেছে। সেদিনই সে হৎকৎ যাচ্ছিল। দারুণ ব্যক্তি। কথা বলার সময় নেই। এর মধ্যেই সে পেশ্টি কোক খাইয়েছে। পূর্ণাগীর পেশ্টি, স্বাদই অন্য রকম। মাঝেনের মত ঘোলায়ে। মুখের মধ্যেই গলে যায়। চাবাতে হয় না।’

‘আপনার খুব ধৰ্মিষ্ট বক্ষ ?’

‘বললাম না স্কুল-জীবনের বক্ষ। নাম হল গিয়ে আপনার ইয়াকুব। স্কুলে সবাই ডাকত — বেকুব !’

‘আসলেই বেকুব ?’

‘তখন তো বেকুবের মতই ছিল। তবে স্কুল-জীবনের স্বভাব-চরিত্র দেখে কিছু বোঝা যায় না। আমাদের ফাস্ট বয় ছিল বশিদ। আবে সর্বনাশ, কি ছাত্র ! অংকে কোন দিন ১০০-র নিচে পায় নাই। প্রিটেস্ট পরীক্ষায় এক্সট্রা ভুল করেছে। সাত নাম্বার কাটা গেছে। কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিল। সেই বশিদের সঙ্গে একশ বছর পর দেখা। গাল-টাল ভেঙে, চুল পেকে কি অবস্থা ! চশমার একটা ডাগু ভাঙা, সুতা দিয়ে কানের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। দেখে মনটা খারাপ হল !’

‘অংকে একশ পাওয়া হলের এই অবস্থা, যন খারাপ হবারই কথা। অংকে টেনে-

চুনে পাশ করলে কানে সুতা বেঁধে চশমা পরতে হত না !’

‘কারেষ্ট বলেছেন। একশ বছর পর দেখা — কোথায় কুশল জিজ্ঞেস করবে, ছেলেমেয়ে কতবড় এইসব জিজ্ঞেস করবে — তা না, ফট করে একশ টাকা ধার চাইল !’

‘ধার দিয়েছেন ?’

‘কুড়ি টাকা পকেটে ছিল, তা-ই দিলাম। খুশি হয়ে নিয়েছে।’

‘মেসের ঠিকানা দেননি তো ? মেসের ঠিকানা দিয়ে থাকলে মহা বিপদে পড়বেন। দুদিন পরে পরে টাকার জন্যে বসে থাকবে। আপনার জীবন অতিষ্ঠ করে ফেলবে !’

বদরুল সাহেব দুঃখিত গলায় বললেন, স্কুল-জীবনের বক্ষ তো — দুরবস্থা দেখে মনটা এত খারাপ হয়েছে, আমার নিজের চোখে প্রায় পানি এসে গিয়েছিল। সুতা দিয়ে কানের সাথে চশমা বাঁধা —

বদরুল সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর নিজের ভবিষ্যতের চেয়ে বক্ষের ভবিষ্যতের চিন্তায় তাঁকে বেশি কাতর বলে যনে হল।

‘হিমু ভাই !’

‘ছি !’

‘ভাল একটা নাশতা হয়ে গেল, কি বলেন ?’

‘হ্যাঁ, হয়েছে। আপনি যে কষ্ট করে আমার অংশটা জমা করে রেখেছেন তাঁর জন্যে ধন্যবাদ !’

‘আরে ছিঃ ছিঃ ! এটা একটা ধন্যবাদের বিষয় হল ? এতদিন পর ফিল্ট হচ্ছে আপনি বাদ পড়বেন এটা কেমন কথা ? তাছাড়া আপনি যেদিন মেসে খান না সেদিনের খাওয়াটা আমি খেয়ে ফেলি !’

‘ভাল করেন। অবশ্যই খেয়ে ফেলবেন। দেশে টাকা পাঠিয়েছেন ?’

‘গত মাসে পাঠিয়েছি। এই মাস বাদ পড়ে গেল। তবে সমস্যা হবে না, আমার স্ত্রী খুবই বুদ্ধিমতী মহিলা — সে ব্যবস্থা করে ফেলবে !’

‘আপনার চাকরি যে নেই সেই খবর স্ত্রীকে জানিয়েছেন ?’

‘ছি-না। আপনার ভাবী মনটা খারাপ করবে। কি দরকার ! চাকরি তো পাচ্ছই, যাবানানে কিছুদিনের জন্যে টেনশানে ফেলে লাভ কি ? আজই ইয়াকুবের সঙ্গে দেখা করব। সংস্কৃতে একটা কথা আছে না — “শূভ্রস্য শীত্রম্”। তা খাবেন হিমু ভাই ?’

‘ছি-না। দরজা-টরজা বক্ষ করে লম্বা ঘূম দেব। আমার স্বভাব হয়ে গেছে বাদুরের মত। দিনে ঘূমাই রাতে জেগে থাকি।’

‘কাজটা ঠিক হচ্ছে না ভাই সাহেব ! শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শরীর নষ্ট হলে — মন নষ্ট হবে। আমার শরীরটা ঠিক আছে বলেই এত বিপদে-আপদেও মনটা ঠিক আছে। শরীরটা ঠিক রাখবেন।’

‘আমার আবার উল্টা নিয়ম। মনটাকে ঠিক রাখি যাতে শরীর ঠিক থাকে।’

বদরুল সাহেব বাটি এবং চামচ নিয়ে উঠে দাঁড়ানেন। লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন,  
ছোট একটা কাজ করে দেবেন হিমু ভাই!

‘ছি, বলুন।’

‘মেসের ম্যানেজার আমাকে বলেছে সোমবারের মধ্যে মেস ছেড়ে দিতে।  
আজেবাজে সব কথা। গালাগালি। আপনি যদি একটু বলে দেন! ও আপনাকে শানে।’

‘আমি এক্ষনি বলে দিছি।’

‘তাকে বললাম যে চাকরি হয়ে যাচ্ছে। ইয়াকুবকে বলেছি। এত বড় গামেটিস-এর  
মালিক। চাকরি তার কাছে কিছুই না। সে একটা নিঃশ্বাস ফেললে দশটা লোকের  
এমপ্লায়মেন্ট হয়ে যায়। বিশ্বাস করে না। আপনি বললে বিশ্বাস করবে।’

আমাদের ম্যানেজারের নাম হায়দার আলি খাঁ। নামের সঙ্গে তার চেহারার কোন  
সঙ্গতি নেই। রোগা, বেঁটে একজন মানুষ। বেঁটেরা সচৰাচর কুঁজো হয় না। তিনি  
খানিকটা কুঁজো। ব্যক্তিবিশেষের সামনে তার কুঁজোভাব প্রবল হয়। আমি সেই  
ব্যক্তিবিশেষের একজন। তিনি কোন কারণ ছাড়াই আমাকে ভয় পান।

হায়দার আলি খাঁ চেয়ারে গুটিসূটি মেরে বসে আছে। পিরিচে করে চা খাচ্ছে। এই  
লোককে আমি কখনো চায়ের কাপে করে চা খেতে দেখিনি। আমি কাছে এসে  
হাসিমুরে বললাম, ভাই সাহেব, খবর কি?

ভদ্রলোক যেভাবে চমকালেন তাতে মনে হল, সাত রেষ্টোর স্কেলের একটা  
ভূমিকম্প হয়ে গেছে। পিরিচের সব চা তাঁর জামায় পড়ে গেল। আমি বললাম,  
করছেন কি?

‘চা খাচ্ছি স্যার।’

‘শুব ভাল। বেশি বেশি করে চা খান। রিসার্চ করে নতুন বের করেছে — দৈনিক যে  
সাত কাপ চা খায় তার হাতের আর্টারি কখনো ঝুক হয় না।’

‘ধ্যাংক মুঃ, স্যার।’

যেভাবে তিনি ধ্যাংক মুঃ বললেন তাতে ধারণা হতে পারে হাতের আর্টারি সংক্রান্ত  
রিসার্চটা আমার কর্য। আমি অবসর সময়ে মেসের ঘরের দরজা বন্ধ করে রিসার্চ  
করেছি।

‘বদরুল সাহেবকে নাকি নোটিশ দিয়ে দিয়েছেন — কথা কি সত্যি?’

‘ছি। তিনি মাসের কেট বাকি। আর নানান যন্ত্রণা করে। বোর্ডারয়া নালিশ করেছে।’

‘কি যন্ত্রণা করেছে?’

‘রান্নার সময় বাবুচির পাশে বসে থাকে। ফিস্ট হয়েছে, ত্রিশ’ টাকা করে চাঁদা।  
একটা পয়সা দেয় নাই — ফিস্ট খেয়ে বসে আছে।’

‘চাঁদা না দিলেও খাটাখাটিনি তো করেছে। গোশত কিনে আনা, খাসির গোশত যে  
কেউ কিনতে পারে না। শুবই জটিল ব্যাপার। খাসি ভেবে কিনে এনে রান্নার পর প্রকাশ

পার পাঠা।’

হায়দার আলি খাঁ তাকাচ্ছেন। আমার কথাবার্তার ধরন বুঝতে পারছেন না। কি  
বলবেন তাও গুছিয়ে উঠতে পারছেন না।

‘ম্যানেজার সাহেব?’

‘ছি স্যার।’

‘বদরুল সাহেবকে আর কিছু বলবেন না।’

‘তিনি মাসের কেট বাকি পড়ে গেছে। অন্য পার্টিকে কথা দিয়ে ফেলেছি। মানুষের  
কথার একটা দাম আছে। ঠিক না স্যার?’

‘ঠিক তো বটেই। কথার দাম আগে যা ছিল মুদ্রাস্ফীতির কারণে সেই দাম আরো  
বেড়েছে। তবু একটা ব্যবস্থা করুন। এক মাসের মধ্যে সব পেমেন্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে।’

‘কিভাবে হবে? শুনেছি উনি ছাঁটাই হয়ে গেছেন। অফিসের পাওনা টাকাপয়সাও  
দিচ্ছে না। টাকাপয়সার কি না-কি গণগোল আছে?’

‘গণগোল তো থাকবেই। পৃথিবীতে বাস করবেন আর গণগোলে পড়বেন না, তা  
তে হয় না। এই গণগোল নিয়েই বাস করতে হবে। উপায় কি? মনে থাকবে তো কি  
বললাম?’

‘ছি স্যার।’

আমি ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। ম্যানেজার অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে  
ছি স্যার বলেছে বলেই ঠিক ভরসা পাচ্ছি না। বিনয়ের বাড়াবাড়িটাই সদেহজনক।  
আমার নিজের ধারণা বিনয় ব্যাপারটা পৃথিবী থেকে পুরোপুরি উঠে গেলে পৃথিবীতে  
বাস করা সহজ হত। বিনয়ের কারণে সত্য-মিথ্যা প্রভেদ করা সমস্যা হয়। মিথ্যার  
সঙ্গে বিনয় মিশিয়ে দিলে সেই মিথ্যা ধরার কারো সাধ্য থাকে না।

ঘুমের চেষ্টা করছি। শুম আসছে না। বেশ কয়েকদিন থেকে নিম্ন এবং জাগরণের  
সাইকেলটা বদলাবার চেষ্টা করছি। রাত ঘুমের জন্যে এবং দিন জেগে থাকার জন্যে,  
এই নিয়ম ভাঙ্গা দরকার। মানুষ ঘুমকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সূর্য নিয়ন্ত্রণ করবে না। সূর্য  
হচ্ছে চুলন্ত অগ্নিগোলক। মানুষের মত অসাধারণ মেধার প্রণালোগাষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করার  
তার কোন অধিকার নেই।

ঢানা শুম দিলাম। শুম ভাঙ্গল সঞ্চায় সঞ্চায়। এই সময় মেসটা ফাঁকা ফাঁকা থাকে।  
বেশির ভাগই চা-নাশতা খেতে বাইরে যায়। মেসে শুধু এককেলা খাবার ব্যবস্থা, রাতে।  
এক কাপ চা খেতে হলেও বাস্তা পার হয়ে শ্টেলে যেতে হবে। ইদানীং অবশ্যি নতুন এক  
চাওয়ালা শ্রেণীর উন্নত হয়েছে। এরা বিশাল ফ্লাস্কে করে চা ফেরি করে। চায়ের দাম  
ফিল্ড — এক টাকা কাপ। চিনি বা দুধের দাম বাড়লে কাপের সাইজ ছোট হয় কিন্তু  
চায়ের দামের হের-ফের হয় না। আমাদের এখনে যে ছেলে চা বিক্রি করে তার নাম  
মতি। দেখতে রাজপুত্রের মত, আসলে ভিখিরিপত্র।

বারান্দায় এসে মর্তিকে খুঁজলাম। মতি এখনো আমেনি, তবে অপরিচিতি এক ভদ্রলোক এসেছেন। শুকনো মুখে টুলে বসে আছেন। ভদ্রলোক অপরিচিত হলেও দেখামাত্র চিনলাম — কারণ তাঁর চশমার একটা উট ভাঙা সূতা দিয়ে কানের সঙ্গে ধাঁধা। ভদ্রলোক সন্দেহজনক দৃষ্টিতে আমাকে দেখছেন। আমি বললাম, কি ভাই, ভাল আছেন?

তিনি হকচকিয়ে গেলেন। উঠে দাঁড়ালেন।

‘বদরুল সাহেবের কাছে এসেছেন, তাই তো?’

‘জ্ঞি স্যার?’

‘টাকা ধারের জন্যে?’

ভদ্রলোকে খানিকটা বিভাস্ত হয়ে গেছেন। চট করে কিছু বলতে পারছেন না। আবার খুব চেষ্টা করছেন কিছু বলতে।

আমি বললাম, বদরুল সাহেব আমাকে আপনার কথা বলেছেন। খুবই প্রশংসন করছিলেন। প্রি-টেস্ট পরীক্ষায় একটা এক্সট্রা না-কি ভুল হয়েছিল। তাড়াহড়া করেছিলেন নিশ্চয়ই। অনেক সময় ওভার কনফিডেন্সেও সমস্য হয়। যাই হোক, কেমন আছেন বলুন।

‘ছি ভাল। বদরুল কখন আসবে?’

‘উনি আসবেন কোথাকে?’

‘এখানে থাকেন না?’

‘আগে থাকতেন। মেসে অনেক বাকি পড়ে গেছে। চারদিকে ধার-দেনা। পালিয়ে গেছেন।’

‘নিচের ম্যানেজার সাহেব আমাকে বললেন, মেসেই থাকে।’

‘ম্যানেজার তাই বলেছে? সে রকমই বলার কথা। সেও জানে না। জানলে জিনিসপত্র ক্রোক করে রেখে দিত। চুপি চুপি পালিয়েছে। শুধু আমি জানি। আপনাকে বললাম, কারণ আপনি তাঁর ফ্লোজ ফ্লেন্ড। ছাত্র জীবনের বন্ধু। অংকে সব সময় হাই শার্ক পেয়েছেন।’

‘বদরুল থাকে কোথায়?’

‘সেটাও বলা নিষেধ। যাই হোক, আপনাকে বলছি। দয়া করে খবরটা গোপন রাখবেন; উনি টেকনাফের দিকে চলে গেছেন।’

‘কোন দিকে গেছে বললেন?’

‘টেকনাফের দিকে। চিটাগাং হিল ট্রেস্ট। তাঁর দূর সম্পর্কের এক মামা আছেন, বন বিভাগে চাকরি করেন, তাঁর কাছে গেছেন। কিছু মনে করবেন না, আপনার নামটা যেন কি?’

‘আবদুর রশীদ।’

‘শুনুন আবদুর রশীদ সাহেব। উনার জন্যে অপেক্ষা করে নাভি নেই। এখানে উনার

বেঁজে আসাও অথবাইন। চলে যান।’

‘চলে যাব?’

‘আপনাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারি, শুধু চা। খাবেন?’

আবদুর রশীদ হ্যানা কিছুই বলল না। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সে পুরোপুরি আশাহত। আমি ভদ্রলোককে চা খাওয়াতে নিয়ে গেলাম। চা খাওয়ালাম, সিঙ্গাড়া খাওয়ালাম। এইখানেই শেষ করলাম না, রাস্তার পাশে ঘড়ি সাবাইয়ের দেকানে নিয়ে গিয়ে চশমার উট লাগিয়ে দিলাম। আমার সর্বমোট ১৩ টাকা খরচ হল।

ভদ্রলোক বললেন, ভাই সাহেব, আপনাকে একটা কথা বলি যদি কিছু মনে না করেন। আপনি ভেবে বলছি।

‘বলুন, কিছু মনে করব না।’

‘কথাটা বলতে খুবই লজ্জা পাচ্ছি। আপনি অতি মহৎপ্রাণ এক ব্যক্তি। আপনাকে বিশ্বত করতেও লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে....’

‘মাথা কাটা যাওয়ার কিছু নেই, আপনি বলুন।’

‘দারুণ এক সংকটে পড়েছি ভাই সাহেব। আত্মহত্যা ছাড়া এখন আর পথ দেখছি না।’

‘ছেলে অসুস্থ। টাকার অভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না?’

‘ধরেছেন ঠিকই। তবে ছেলে না, মেয়ে। কনিষ্ঠা কন্যা। সকাল থেকে হাঁপানির মত হচ্ছে। ডাক্তার ইনজেকশনের কথা বলল —’

‘দায় কর্ত ইনজেকশনের?’

‘শখানেক টাকা হলে হয়। ইনজেকশন, সেই সঙ্গে কি ট্যাবলেট মেন দিয়েছে। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, চিকিৎসা করার টাকা কোথায়? তুমি বরং গলা টিপে মেরে ফেল।’

‘উনি গলা টিপে মারতে রাজি হচ্ছেন না?’

আবদুর রশীদ আমার এই কথায় অস্বস্তিতে পড়ে গেল। আমি বললাম, এইসব কঠিন কাজ শ্রীলোক দিয়ে হবে না। এইসব হল পুরুষের কাজ। গলা টিপে মারতে হলে আপনাকেই মারতে হবে।

‘ভাই সাহেব, ঠাট্টা করছেন?’

‘না, ঠাট্টা করছি না। মৃত্যু কোন ঠাট্টা-তামাশার বিষয় না। আমি আপনাকে একশ টাকা দেব।’

‘দিবেন? সত্যি দিবেন?’

‘অবশ্যই দেব। শ্বেত-জীবনে আপনি অংকে খুব ভাল ছিলেন, তাই না? কেমন ভাল ছিলেন প্রমাণ দিন দেবি। সহজ একটা অংক জিঞ্জেস করব। কারেন্ট উন্তর দেবেন — একশ টাকা নিয়ে চলে যাবেন।’

আবদুর রশীদ ক্ষীণ স্বরে বলল, কি অংক?

‘একটা বাড়িতে চারটা হারিকেন জ্বলছিল। গভীর রাতে কথা নেই বাতা নেই ওফ হল বড়। একটা হারিকেন গেল নিভে। এখন আপনি বলুন এই বাড়িতে হারিকেন এখন কয়টা?’

‘তিনটা !’

আমি দীর্ঘ নিশ্চাস ফেলে বললাম, হয়নি। একটা হারিকেন নিভে গেছে ঠিকই। হারিকেনের সংখ্যা তো কমেনি। হারিকেন চারটাই আছে। আপনি তো ভাই অংক শিরতে পারেননি। ঢাকাটা দিতে পারলাম না। কিছু মনে করবেন না।

আবদুর রশীদ দাঁড়িয়ে আছে — আমি হাঁটা ধরেছি। মেসে ফিরে যাব। সারাদিন কিছু না খাওয়াতে খিদেয় নাড়িভৃতি পাক দিচ্ছে। মেসে রান্না হয়েছে কি-না খোজ নিতে হবে। মেসের ভাত সকাল সকাল নেমে যায়। ভাত নেমে গেলে একটা ডিম ভেজে দিতে বলব। আগুন-গরম ভাত ডিমভাজা দিয়ে খেতে অতি উপাদেয়। তবে খেতে হয় চুলা থেকে ভাত নামার সঙ্গে সঙ্গে, দেবি করা যায় না।

ঘর থেকে বেরবার অন্তে রাত বারোটা খুব ভাল সময়। জিম্মে-আওয়ার। কাউট আপ শুরু হয় জিরো আওয়ার থেকে — ০, ১, ২, ৩ . . . ঠিক রাত বারোটায় কি বার হবে? শনিবার নয়, রবিবারও নয়। জিরো আওয়ারে বার থেমে থাকে।

দরজা তালাবন্ধ করে বেরুচি, দেবি বদরুল সাহেব। কলম্বর থেকে হাত-মুখ শুয়ে ফিরছেন। মুখ ভোজা, কাঁধে গামছা। রাত বারোটায় আমার মন-টন খুব ভাল থাকে। কাজেই আমি উল্লাসের সঙ্গেই বললাম, কি খবর বদরুল সাহেব!

তিনি লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন।

‘কোথায় ছিলেন আজ সারাদিন?’

তিনি আবারো হাসলেন। আমি বললাম, গিয়েছিলেন নাকি ইয়াকুব আলির কাছে?

‘ছি।’

‘দেখা হয়নি?’

‘দেখা হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যস্ত।’

‘কথা হয়নি?’

‘হয়েছে। চাকরির ব্যাপারটা বললাম।’

‘আগেও তো বলেছিলেন। আবার কেন?’

‘ভুলে গিয়েছে। নানান কাজকর্ম নিয়ে থাকে তো। আজকে তার আবার একটা দুর্ঘটনা ঘটল। তার মনটা ছিল খারাপ।’

‘কি দুর্ঘটনা?’

‘একুশ লাখ টাকা দিয়ে নতুন গাড়ি কিনেছে। সেই গাড়ির হেলাইট ভেঙে ফেলেছে। কেয়ারলেন্স ড্রাইভার। এই নিয়ে নানান হৈ-চৈ, ধর্মকাথমকি চলছে, তার মধ্যে আমি গিয়ে পড়লাম।’

‘আপনি ধর্মক খেয়েছেন?’

‘ছি-না, আমি ধর্মক খাব কেন? আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ভেবি ক্লোজ ফ্রেন্ড। গাড়ির হেলাইট ভাঙার কারণে ইয়াকুবের মন খারাপ দেখে আমারো মন খারাপ হল। এর মধ্যে চাকরির কথাটা ভুল ভুল করেছি।’

‘ইয়াকুব সাহেব রেগে গেছেন?’

‘তা ঠিক না। বলল বায়োডাটা। তার সেক্রেটারির কাছে দিয়ে যেতে। দুটা পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ বায়োডাটা, সে দেখবে।’

‘দেখবে বলেছে?’

‘দেখবে তো বটেই। স্কুল-জীবনের বন্ধু, ফেলবে কি করে? বায়োডাটা নিয়েই সারাদিন ছেটাচুটি করলাম। একদিনের মধ্যে ছবি তুলে, বায়োডাটা টাইপ করে, পাঁচটার সময় একেবারে ইয়াকুবের হাতেই ধরিয়ে দিয়েছি।’

‘ইয়াকুব সাহেবের আপনার কর্মতৎপরতা দেখে নিশ্চয়ই খুব খুশ হলেন।’

বদরুল চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, খুশ হলনি?

‘ছি-না। একটু মনে হয় বেজা হয়েছে; সেক্রেটারির হাতে দিতে বলেছে, আমি তা না করে তার হাতেই দিলাম — এতে সাধান্য বিরক্ত। এত বড় একটা অগ্রন্থিজ্ঞান চালায়। তার তো একটা সিস্টেম আছে। ছট করে হাতে কাগজ ধরিয়ে দিলে হবে না। ভুলটা আমার।’

‘বদরুল সাহেব, আপনার কি ধারণা ইয়াকুব আলি আপনাকে চাকরি দেবেন?’

‘অবশ্যই। আমার সমন্বে সেক্রেটারিকে ডেকে বায়োডাটা দিয়ে দিল। বলল উপরে আর্জেন্ট লিখে ফাইলে রাখতে।’

‘কবে নাগাদ চাকরি হবে বলে মনে করছেন?’

‘খুব বেশি হলে এক সপ্তাহ। ইয়াকুব আমাকে এক সপ্তাহ পরে খোজ নিতে বলেছে। আগামী শনিবারের মধ্যে ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে। স্বপ্নেও তা-ই দেখলাম।’

‘এর মধ্যে স্বপ্নও দেখে ফেলেছেন?’

‘ছি। ছোট্টুটি কাবে কাগজপত্র জোগাড় করে টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবলাম, একটু বেস্ট নেই। ইয়াকুবের পি. এ. বলল, বসুন, চা খান। চা খাওয়ার জন্যে বসেছি। বসে থাকতে থাকতে খিমুনির মত এসে গেল। তখন স্বপ্নটা দেখেছি। দেখলাম কি — ইয়াকুব এসেছে। তার হাতে বিরাট এক মৃগেল মাছ। এইমাত্র ধরা হয়েছে। ছটফট করছে। ইয়াকুব বলল, নিজের পুরুরের মাছ। তোর জন্যে আনলাম। নিয়ে যা। মাছ স্বপ্নে দেখা খুবই ভাল। হিমু ভাই, আপনি যাচ্ছেন কোথায়?’

‘ইঠাতে যাচ্ছি।’

‘রাতদুপুরে কেউ ইঠাতে যায়? আশ্চর্য! দুপুর রাতে ইঠাতার মধ্যে আছে কি?’

‘চলুন, আমার সঙ্গে হেঠে দেখুন।’

‘যেতে বলছেন?’

‘এক রাতে একটু অনিয়ম করলে কিছু হবে না।’

‘খুবই টায়াড লাগছে হিমু ভাই। ভাবছি শুধুব।’

‘শুম তো আপনার আসবে না। খিদে পেটে শুয়ে ছটফট করবেন। এরচে’ চলুন কোথাও নিয়ে গিয়ে আপনাকে খাইয়ে আনি। মনে হচ্ছে সারাদিন কিছু খাননি।’

‘সারাদিন খাইনি কি করে বুঝলেন?’

‘বোধ্য যায়। মানুষের সব খবর তার চেবে লেখা থাকে। ইচ্ছে করলেই সেই লেখা পড়া যায়। কেউ ইচ্ছে করে না বলে পড়তে পারে না।’

‘আপনি পারেন?’

‘মাঝে মাঝে পারি। সব সময় পারি না। আপনি যে সারাদিন খাননি এটা আপনার চেবে পড়তে পারছি। এই সঙ্গে আরেকটা জিনিশ পড়া যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে, আজ দিনটা আপনার জন্যে খুব আনন্দের।’

বদরুল সাহেব হতভয় হয়ে তাকিয়ে আছেন। হতভয় ভাব কটার পর বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আজ আমার বিবাহ যাবিকী। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, সক্ষ্যার সময় হঠাতে মনে হয়েছে — আরে আজ তো ২৫শে এপ্রিল।

‘চলুন, রাস্তায় ইঁটিতে ইঁটিতে বিয়ের দিনের গল্প করবেন। অনেকদিন কারো বিয়ের গল্প শুনি না।’

বদরুল সাহেব লজ্জিত গলায় বললেন, বলার মত কেন গল্প না।

‘সব গল্পই বলার মত।’

রাস্তায় নেমেই বদরুল সাহেব বিশ্বিত স্বরে বললেন, ইঁটিতে তো ভালই লাগছে। রাস্তাগুলি অন্য রকম লাগছে। আশ্চর্য তো! ব্যাপারটা কি?

আমি ব্যাপার ব্যাখ্যা করলাম না। রাতের বেলা রাস্তার চরিত্র বদলে যায় কেন সেই ব্যাখ্যা একেক জনের কাছে একেক রকম। আমার ব্যাখ্যা আমার কাছেই থাকুক।

বদরুল সাহেব বললেন, ইঁটিতে ইঁটিতে আমরা কোথায় যাব?

আমি বললাম, যাখায় কোন সিদ্ধিট জায়গা থাকলে ইঁটার কোন আরাম থাকে না। ইঁটিতে হবে এলোমেলোভাবে। বলুন কিভাবে আপনাদের বিয়ে হল।

‘মুসিগঞ্জে বেড়াতে গিয়েছিলাম। খালার শুণরবাড়িতে। ওদের একান্নবর্তী পরিবার। লোকজন গিজ গিজ করছে। কে কখন যায় কোন ঠিক নেই। খাওয়া-দাওয়ার ভেতরে কোন যত্ন নেই। খেলে খাও, না খেলে খেও না ওই রকম ভাব। মাঝে মাঝে কি হয় জানেন? ভাল একটা পদ হয়ত রাখা হচ্ছে, এদিকে বেশির ভাগ মানুষ খেয়ে উঠে গেছে। কেউ জানেই না — মূল পদ এখনো রাখা হয় নি।’

বদরুল সাহেব তাঁর বিয়ের গল্পের জায়গায় খাওয়ার গল্প ফেঁদে বসেছেন। এই খাওয়া-দাওয়ার ভেতর থেকে বিয়ের গল্প হয়ত শুরু হবে, কখন হবে কে জানে। ভদ্রলোকের সম্ভবত খিদেও পেয়েছে। খিদের সময় শুধু খাবার কথাই মনে পড়ে। তাঁকে

খাওয়ানোর কি ব্যবস্থা করা যায় বুঝতে পারছি না। আবারো পকেটবিহীন পাঞ্জাবি নিয়ে বের হয়েছি। এই পাঞ্জাবি মনে হয় আর ব্যবহার করা যাবে না। বদরুল সাহেব গল্প চালিয়ে যাচ্ছেন — সেদিন কি হয়েছে শুনুন। পাবদা মাছ এসেছে। এক খুনই মাছ, প্রত্যেকটা দেড় বিষৎ সাইজ। এ বাড়িতে আবার অল্প কিছু আসে না। যা আসে বুড়ি ভর্তি আসে . . .

আমরা মূল রাস্তা ছেড়ে গলিতে চুকলাম। বদরুল সাহেবের গল্পে বাধা পড়ল। আমরা টহল পুলিশের মুখোমুখি পড়ে গেলাম। খাকি পোশাকের কারণে সব পুলিশ একরকম মনে হলেও এটি যে গতকালেরই দল এতে আমার কোন সন্দেহ রইল না। আমি আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, কি খবর?

টহল পুলিশের দল থমকে দাঁড়াল।

‘আজ আপনাদের পাহারা কেমন চলছে?’

এই প্রশ্নেরও জবাব নেই। বদরুল সাহেব হকচকিয়ে গেছেন। কথাবার্তার ধরন ঠিক বুঝতে পারছেন না।

কালকের ওস্তাদজি আজও প্রথম কথা বললেন, তবে তুই-তোকারি না, ভদ্র ভাষা।

‘আপনারা কোথায় যান?’

‘ভাত খেতে যাই। আজ অবশ্যি আমি খাব না। এই ভদ্রলোক খাবেন। উনার নাম বদরুল আলম। উনাকে থাপ্পড় দিতে চাইলে দিতে পারেন। উনিও কিছু বলবেন না। উনিও আমার মতই বিশিষ্ট ভদ্রলোক।’

বদরুল সাহেব ফিসফিস করে বললেন, ব্যাপারটা কি কিছুই তো বুঝতে পারছি না। কি সমস্যা?

‘কেন সমস্যা না। জনগণের সেবক পুলিশ ভাইরা এখন আপনার রাতের খাবার ব্যবস্থা করবেন।’

পুলিশ দলের একজন বলল, কালকের ব্যাপারটা মনে রাখবেন না। নানা কিসিমের বদলোক রাস্তায় ঘুরে, মেশা করে। আমরা বুঝতে পারি নাই। একটা মিসটেক হয়েছে।

‘আমি কিছু মনে করিনি। মনের ভেতর অতি সামান্য খচখচানি আছে, সেটা দূর হয়ে যাবে — যদি আপনারা বদরুল সাহেবের রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।’

‘এত রাতে?’

‘আপনাদের কারবারই তো রাতে। আপনাদের একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দি — কোন একটা বাড়িতে গিয়ে কলিংবেল টিপুন। বাড়িওয়ালা দরজা খুলে এতগুলি পুলিশ দেখে যাবে ভড়কে। তখন আপনাদের যে ওস্তাদ তিনি বিনীত ভদ্রিতে বলবেন, স্যার, এত রাতে ডিস্টার্ব করার জন্যে খুবই দুঃখিত। একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক সারাদিন না থেকে আছেন। যদি একটু খাওয়ার ব্যবস্থা করেন! দেখবেন তৎক্ষণাত খাবার ব্যবস্থা হবে। মধ্যরাতের পুলিশ ভয়াবহ জিনিশ।’

বদরুল সাহেবের হতভন্ন ভাব কাটিছে না। তাঁর কৃধা-কৃষ্ণও সম্বৰত মাথায় উঠে গেছে। পুলিশ দলের একজন আমার কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, স্যার, আপনার সঙ্গে একটু 'প্রাইভেট টক' আছে।

আমি 'প্রাইভেট টক' শোনার জন্যে ফুটপাত ছেড়ে নিচে নামলাম। সে কানের কাছে গুন গুন করে বলল, স্যার, বিবাট মিসটিকে হয়েছে। রাস্তায় কত লোক হাঁটে, কে সাধু, কে শয়তান বুঝব কি ভাবে!

আমিও তার মতই নিচু গলায় বললাম, না বোঝারই কথা।

'ওন্দাদজী একটা ভুল করেছে। চড় দিয়ে ফেলেছে। তারপর থেকে উনার হাত ফুলে প্রচণ্ড ব্যথা। ব্যথার চোটে রাতে ঘুমাতে পারেননি।'

'বেকায়দায় চড় দিয়েছে। বগে টান পড়েছে। কিংবা হাতের মাসলে কিছু হয়েছে।'

'কি যে ব্যাপার সেটা স্যার আমরা বুঝে গেছি। এখন স্যার আমাদের ক্ষমা দিতে হবে। এটা স্যার আমাদের একটা আবদার।'

'আচ্ছা যান, ক্ষমা দিলাম।'

'ওন্দাদজী আজ ছুটি নিয়েছে। সারাদিন শুয়েছিল, রাতে বের হয়েছে শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য।'

'ভালই হয়েছে দেখা হয়ে গেল।'

'আপনি স্যার আমাদের জন্যে একটু দোয়া রাখবেন।'

'অবশ্যই রাখব।'

'উনার খাবার ব্যাপারে স্যার কেন চিন্তা করবেন না।'

আমি বদরুল সাহেবকে বললাম, আপনি এদের সঙ্গে যান। খাওয়া-দাওয়া করুন। তারপর মেসে চলে যাবেন। আমি ভোরবেলা ফিরব।

তিনি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছেন। কিছুতেই যাবেন না। পুলিশরা বলতে গেলে তাকে গ্রেফতার করেই নিয়ে গেল। বেচারার হতাশ দৃষ্টি দেখে যায়া লাগছে। যায়া ভাল জিনিশ না। অনিত্য এই সংসারে যায়া বিসর্জন দেয়া শিখতে হয়। আমি শেখার চেষ্টা করছি।



বাদুর-স্বত্ত্বাব আয়ত্ত করার চেষ্টা সফল হচ্ছে না। বাদুর-ভাব কয়েকদিন থাকে তারপর ভেতর থেকে মানুষ-ভাব মাথাচাঢ়া দিয়ে ওঠে। রাতে ঘুমুতে ইচ্ছে করে। দিনে হাজার চেষ্টা করেও ঘুমুতে পারি না। এখন আমার মানুষ ফেজ চলছে। রাতে ঘুমুছি, দিনে জেগে আছি। রাস্তায় যাচ্ছি। ইঁটাইঁটি করছি। দিনে ইঁটাইঁটি করার মধ্যেও কিছু প্রিল আছে। হঠাৎ হঠাৎ খুব বিপদজনক কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। যার সঙ্গে নিশি রাতে দেখা হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। রাত তিনটার সময় নিশ্চয়ই রেশমা খালার সঙ্গে নিউমার্কেটের কাছে দেখা হবে না। প্রায় দুবছর পর রেশমা খালার সঙ্গে দেখা। পাজেরো নামের অভ্যন্তর গাড়ির ভেতর ড্রাইভারের সিটের পাশে তিনি বসে আছেন। তাঁর মত মহিলা ড্রাইভারের পাশে বসবেন ভাবাই যায় না। তবে শুনেছি পাজেরো গাড়িগুলি এখন যে ড্রাইভারের সীটের পাশে বসা যায়। এতে সম্মান হানি হয় না।

রেশমা খালা হাত উচিয়ে ডাকলেন, এই হিমু, এই . . . ড্রাইভার ক্রমাগত হ্রন্দিতে লাগল। আমার উচিত দ্রুত পালিয়ে যাওয়া। কোন গলিটলির ভেতর চুকে পড়। গলি না থাকলে ম্যানহোলের ঢাকনি খুলে তার ভেতর দৈর্ঘ্যে যাওয়া। কিছু কিছু ট্রাকের পেছনে লেখা থাকে ১০০ হাত দূরে থাকুন। রেশমা খালা সেই ট্রাকের চেয়েও ভয়াবহ। আশে পাশে গলি বা ম্যানহোল নেই। কাজেই আমি হাসিমুখে এগিয়ে গেলাম। রাস্তা পার হবার আগেই খালা চেঁচিয়ে বললেন, হিমু, তুই নাকি গলার কঁটা নামাতে পারিস?

রেশমা খালা আমার কেমন খালা জানি না। লতায়-পাতায় খালা। ভদ্রমহিলার বয়স পঞ্চাশ পার হলেও এই মৃহূর্তে খুকি সেজে আছেন। মাথা ভর্তি চেউ-খেলানো ঘন কাল চুল। এই চুল হংকং থেকে আনানো। ঠোঁট লাল টুক টুক করছে। জামদানী শাড়ি পরেছেন। গলায় মাটির মালা। কানে মাটির দুল। এটাই লেটেন্ট ফ্যাশন। শাস্তিনিকেতন থেকে আমদানী হয়েছে।

আমি গাড়ির কাছে চলে এলাম। রেশমা খালা চোখ বড় বড় করে বললেন — বাদলের মার কাছে ঘটনা শুনলাম। বড় বড় সার্জন কাত হয়ে গেছে — তুই গিয়েই মন্ত্র-ট্র্যাপ পড়ে কঁটা নামিয়ে ফেললি। কি রে, সত্যি?

'হঁয়া সত্যি। তোমার কঁটা লাগলে খবর দিও, নামিয়ে দিয়ে যাব।'

‘তোকে যবর দেব কি ভাবে? তোর ঠিকানা কি? তোর কোন কার্ড আছে?’

‘ঠিকানাই নাই — আবার কার্ড!’

‘তুই এক কাজ কর না। আমার বাড়িতে চলে আয়। একতলাটা তো খালিই পড়ে থাকে। একটা ঘরে থাকবি। আমার সঙ্গে খাবি। ফ্রী থাকা—খাওয়া’

‘দেখি, চলে আসতে পারি?’

‘আসতে পারি—টারি না। চলে আয়। তুই কাঁটা নামানো ছাড়া আর কি পারিস?’

‘আপত্ত আর কিছু পারি না।’

‘কে মেন সেদিন বলল, তুই ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলতে পারিস। তোর দিক্ষিত সেদ্দ নাকি খুব ডেভেলপড?’

আমি হাসলাম। আমার সেই বিশেষ ধরনের হাসি। হাসি দেখে রেশমা খালা আরো অভিভূত হলেন।

‘এই হিম্ম, গাড়িতে উঠে আয়।’

‘যাচ্ছেন কোথায়?’

‘কোথাও যাচ্ছি না। খালি বাড়িতে থাকতে কতক্ষণ আর ভাল লাগে! এই জন্মেই গাড়ি নিয়ে মাঝে মাঝে বের হই।’

‘বাড়ি খালি না—কি?’

‘ও আমা, তুই কি কিছুই জানিস না? তোর খালুর ইন্টেকালের পর বাড়ি খালি না? এত বড় বাড়িতে একা থাকি, অবস্থাটা চিন্তা করতে পারিস।’

‘দারোয়ান, মালী, ড্রাইভার এরা তো আছে।’

‘খালি বাড়ি কি দারোয়ান, মালী, ড্রাইভার এইসবে ভরে? তুই চলে আয়। তোর কাঁটা নামানোর ক্ষমতার কথা শুনে দারুণ ইন্টারেন্সিং লাগছে। দাঁড়িয়ে আছিস কেন? গাড়িতে উঠ।’

‘আজ তো খালা যেতে পারব না। জরুরি কাজ।’

‘তোর আবার কিসের জরুরি কাজ? হাঁটা ছাড়া তোর আবার কাজ কি?’

‘আরেকজনের কাঁটা নামাতে হবে। চিতলমাছের কাঁটা গলায় বিধিয়ে বসে আছে। কোঁ কোঁ করছে। সেই কাঁটা তুলতে হবে।’

‘আমাকে নিয়ে চল। আমি দেখি ব্যাপারটা কি?’

‘আপনাকে নেয়া যাবে না খালা। মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যাপার তো। মেয়েদের সামনে মন্ত্র কাজ করে না।’

‘মেয়েরা কি দোষ করেছে?’

‘মেয়েরা কোনই দোষ করেনি। দোষ করেছে মন্ত্র। এই মন্ত্র নারী বিদ্যুমী।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে। আমাকে না নিতে চাইলে না নিবি। গাড়িতে উঠ, তোকে কিছুদূর এগিয়ে দি। রোদের মধ্যে হাঁটিস দেখে যাবা লাগছে।’

কেউ গাড়িতে উঠার জন্যে বেশি রকম পিড়াপিড়ি করলে ধরে নিতে হবে গাড়ি

নতুন কেনা হয়েছে। আমি গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম, গাড়ি নতুন কিমনে?

‘নতুন কোথায়, হ্য মাস হয়ে গেলো না।’

‘হ্য মাসে স্বামী পুরাতন হয় — গাড়ি হয় না। দারুণ গাড়ি।’

‘তোর পছন্দ হয়েছে?’

‘পছন্দ মানে! এরোপ্লেনের মত গাড়ি।’

‘এই গাড়ির সবচে বড় সুবিধা কি জানিস? সামনা—সামনি কলিশন হলে গাড়ির কিছু হবে না, কিন্তু অন্য গাড়ি ভর্তা হয়ে যাবে।’

‘বাহ, দারুণ তো।’

‘তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল লাগছে বে হিম্ম। চাকরি—বাকরি কিছু করছিস?’

‘আপনার হাতে চাকরি আছে?’

‘না। তোর খালুর মৃত্যুর পর মিল-টিল সব বিক্রি করে ক্যাশ টাকা করে ফেলেছি। ব্যাকে জমা করেছি। আমি একা মানুষ — মিল-টিল চালানো তো সম্ভব না। সবাই লুটে—পুটে খাবে। দরকার কি?’

‘কোন দরকার নেই।’

গাড়ি চলছে। কোন বিশেষ দিকে যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে ড্রাইভার তার ইচ্ছামত চালাচ্ছে। মীরপুর রোড ধরে চলতে চলতে ফট করে ধানমণি চার নাম্বারে চুকে পড়ল। আবার কিছুক্ষণ পর মীরপুর রোডে চলে এল।

‘হিম্ম!

‘ছি খালা।’

‘তোর খালুর স্মৃতি রক্ষার্থে একটা কিছু করতে চাই। কর্মযোগী পুরুষ ছিল। পথের ফরিদ থেকে কলকারখানা, গাম্রেটস, করেনি এমন জিনিস নেই। শ্রী হিসেবে তার স্মৃতি রক্ষার জন্যে আমার তো কিছু করা দরকার।’

‘করলে ভাল। না করলেও চলে।’

‘না না, করা দরকার। ভাল কিছু করা দরকার। উনার নামে একটা আট মিউজিয়াম করলে কেমন হয়?’

‘ভাল হয়। তবে খালু সাহেবের নামে করা যাবে না। মানাবে না।’

‘মানাবে না কেন?’

‘গনি মিয়া মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট’ শুনতে ভাল লাগছে না। খালু সাহেবের নামটা গনি মিয়া না হয়ে আরেকটু সফেসটিকেটেড হলে মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট দেয়া যেত। তোমার নিজের নামে দাও না কেন? “রেশমা মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট” শুনতে তো খারাপ লাগছে না।’

গাড়ি মীরপুর রোড থেকে আবার ধানমণি ২৭ নম্বারে চুকে পড়েছে। আবারো মনে হয় মীরপুরে আসবে। ভাল যন্ত্রণার পড়া গেল।

‘খালা, আমার তো এখন যাওয়া দরকার। চিতল মাছের কাঁটা নামানো খুব নহজ

না।

‘আহা বোস না। তোর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে। কথা বলার মানুষ পাই না। কেউ আমার বাড়িতে আসে না। এটা একটা আশ্চর্য কাণ। তোর খালুর মৃত্যুবাষিকী উপলক্ষে কার্ড ছাপিয়ে পাঁচশ লোককে দাওয়াত দিয়েছি। তিনটা দৈনিক পত্রিকায় কোয়ার্টার পেইজ বিজ্ঞাপন দিলাম। লোক কত হয়েছে বল তো?’

‘একশ?’

‘আরে না — আঠারো জন। এর মধ্যে আমার নিজের লোকই সাতজন। ড্রাইভার, মালী, দারোয়ান, কাজের দুটা মেয়ে।’

‘আমাকে খবর দিলে চলে আসতাম।’

‘তোকে খবর দেব কি ভাবে? তোর কি কোন স্থায়ী ঠিকানা আছে? ঠিকানা নেই। রাস্তায় যে ফুকিরগুলি আছে তাদেরও ঠিকানা আছে। রাতে তারা একটা নিদিষ্ট জায়গায় ঘুমায়। আজীজ মার্কেটের বারান্দায় যে ঘুমুবে সে স্থানেই ঘুমুবে। সে কমলাপুর রেল স্টেশনে ঘুমুবে না। আর তুই তো আজ এই মেসে, কাল এই মেসে। হিমু, তুই চলে আয় তো আমার কাছে। শুলশানের বাড়ি নতুন করে রিনোভেট করেছি। টাকাপয়সা করচ করে হলুস্কুল করোছি। তোর ভাল লাগবে। আসবি?’

‘ভেবে দেখি।’

‘ভাবতে হবে না। তুই চলে আয়। থাকা-থাওয়ার খরচার হাত থেকে তো বেঁচে গেলি। মাসে মাসে না হয় কিছু হাতখরচও নিবি।’

‘কত দেবে হাতখরচ?’

‘বিড়ি-সিগেরেটের খরচ — আর কি! কি, থাকবি? তুই থাকলে একটা ভরসা হয়। দিনকালের যে অবস্থা চাকর-দারোয়ান এবাই বটি দিয়ে কুপিয়ে কেনেন্দিন না মেরে ফেলে। এমন ভয়ে ভয়ে থাকি! চলে আয় হিমু। আজই চলে আয়। বাড়ি তো চিনিসই। চিনিস না?’

‘হ্যাঁ।’

‘তোকে দেখে আরেকটা কথা ভাবছি — বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা আছে প্যারা নরমাল পাওয়ার যাদের, এদের বাড়িতে এনে রাখলে কেমন হয়? এস্টেলজার, পার্মিস্ট, বুথতে পারছিস কি বলছি?’

‘পারছি — ইস্টেলিউট অব সাইকিক রিসার্চ টাইপ।’

‘ঠিক বলেছিস। বাংলাদেশে তো এরকম আগে হয় নি। না-কি হয়েছে?’

‘না হয়নি। করতে পার। নাম কি দেবে? “গনি মিয়া ইস্টেলিউট অব সাইকিক রিসার্চ”?’

‘নামটা কেমন শুনাচ্ছে?’

‘মিয়াটা বাদ দিলে খারাপ লাগবে না — গনি ইস্টেলিউট অব সাইকিক রিসার্চ। খালা, এইখানে আমি নামব। ড্রাইভার, গাড়ি থামাও। গাড়ি না থামানে আমি জানালা

দিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়ব।’

ড্রাইভার গাড়ি থামালো। রেশমা খালা বলল, কি ঠিক হল? তুই আসছিস?

‘হ্যাঁ। আমার এ মাসের হাতখরচের টাকা দিয়ে দাও।’

‘থাকাই শুরু করলি না — হাতখরচ কি?’

‘আমি তো খালা চাকবি করছি না যে মাসের শেষে বেতন। এটা হল হাত খরচ।’

‘তুই আগে বিছানা-বালিশ নিয়ে উঠে আয়, তারপর দেখা যাবে।’

‘আচ্ছা।’

আমি লম্বা লম্বা পা ফেলা শুরু করলাম। উক্কার পাওয়া গেছে, এখন চেষ্টা করা উচিত যত দূরে সরে পড়া যায়। সন্ধিবনা খুব বেশি যে খালা তার গাড়ি নিয়ে আমার পেছনে পেছনে আসবে। আমার উচিত ছেটি কোন গলিতে ঢুকে পড়া, যেখানে পাজেরো টাইপ গাড়ি ঢুকতে পারে না।

‘এই হিমু, এই, এক সেকেন্ড শুনে যা। এই, এই।’

বধির হয়ে যাবার ভাল করে আমি গলি খুঁজছি। গাড়ির ড্রাইভার ক্রমাগত হর্ন দিচ্ছে। না, ফিরলে চারদিকে লোক জমে যাবে। বাধ্য হয়ে ফিরলাম।

‘নে, হাতখরচ নে। না দিলে আবার হাত খরচ দেয়া হয় নি এই অজুহাতে আসবি না।’

রেশমা খালা একটা চকচকে পাঁচশ টাকার নোট জানালা দিয়ে বাড়িয়ে ধরল।

‘তুই সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় চলে আসিস। সন্ধ্যার পর থেকে আমি বাসায় থাকি। নানান সমস্যা আছে, বুঝলি? ভয়ংকর ব্যাপার ঘটেছে। কাউকে বলা দরকার। রাতে এক ফৌটা ঘুমুতে পারি না।’

‘চলে আসব।’

‘টাকাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? পকেটে রাখ। হারিয়ে ফেলবি তো।’

‘খালা, আমার পকেট নেই। যাবতীয় টাকাপয়সা আমাকে হাতে নিয়ে ঘূরতে হয়।’

‘বলিস কি?’

‘খালা, যাই?’

যাই বলে দেরী করলাম না, প্রায় দোড়ে এক গলিতে ঢুকে পড়লাম।

টাকা কি কেউ হাতে নিয়ে ঘূরে? বাসের কন্ডেন্টোর টাকা হাতে রাখে। আব কেউ? পাঁচশ টাকার চকচকে একটা নোট হাতে রাখতে বেশ ভালই লাগছে। নোটটা এতই নতুন যে ভাজ করতে ইচ্ছা করছে না। চনমনে রোদ ওঠায় গরম লাগছে। নোটের সাইজ আরেকটু বড় হলে টাকা দিয়ে বাতাস খেতে খেতে যাওয়া যেত।

খালার হাত থেকে উক্কার পেয়েছি শ্যামলীতে। সেখান থেকে কোথায় যাব বুঝতে পারছি না। হেঁটে হেঁটে আবার নিউ মার্কেটের কাছে চলে আসা যায়। ইচ্ছা করলে রিকশা নিতে পারি, ভাড়া দেয়া সমস্যা হবে না। বুড়ো অর্থব টাইপ রিকশাওয়ালা

যাদের রিকশায় কেউ চড়ে না, এমন কেউ যে রিকশা ঠিকমত টানতেও পারে না, বয়নের ভাবে কানেও ঠিক শুনে না, গাড়ির সামনে হঠাতে রিকশা নিয়ে উপস্থিত হয় — এইসব রিকশায় চড়া মনে পদে পদে বিপদের মধ্যে পড়া।

যেহেতু রেশমা খালার বাড়িতে আমি থাকতে যাব না, সেহেতু এই পাঁচশ টাকা কোন এক সংকর্মে ব্যয় করতে হবে।

অনেকদিন কোন সংকর্ম করা হয় না। ভাড়া হিসেবে পুরো নোটটা দিয়ে দিলে সাধারণ মানের একটা সংকর্ম করা হবে।

পছন্দসই কোন রিকশাওয়ালা পাওয়া যাচ্ছে না। একজনেক বেশ পছন্দ হল, তবে তার বয়স অল্প। বুড়ো রিকশাওয়ালা কেউই নেই। বুড়োরা আজ কেউই রিকশা বের করেনি। আসাদ গেটে এসে একজনকে পাওয়া গেল। চলনসই ধরনের বুড়ো। রিকশার সীটে বসে চায়ে পাউরুটি ভিজিয়ে থাচ্ছে। সকালের ব্রেকফাস্ট বোধ হয় না, বারোটায় মত বাজে। লাঞ্ছ হ্বারও সন্তানবনা কম। সন্তুষ্ট প্রি-লাঞ্ছ।

‘রিকশা, ভাড়া যাবেন?’

বুড়ো প্রায় ধরকে উঠলো — না। খাওয়ার মাঝখনে বিরক্ত করায় সে সন্তুষ্ট ক্ষেপে গেছে।

‘কাছেই যাব। বেশি দূর না — নিউ মাকেটে।’

‘ও দিকে যায় না।’

‘ফার্ম গেট যাবেন? ফার্মগেট গেলেও আমার চলে।’

‘যায় না।’

‘যাবেন না কেন?’

‘ইচ্ছা করতাছে না।’

‘আমি না হয় অপেক্ষা করি। আপনি চা শেষ করেন, তারপর যাব। ফার্মগেট যেতে না চান তাও সহি। অন্য যেখানে যেতে চান যাবেন। আমাকে কোন এক জায়গায় নামিয়ে দিলেই হবে।’

মনে হল আমার প্রস্তাবে সে বাজি হয়েছে। কিছু না বলে চা-পাউরুটি শেষ করল। লুঙ্গির ভাজ খেকে বিড়ি দের করে আয়েশ করে বিড়ি টানতে লাগল। আমি শৈর্ষ ধরে অপেক্ষা করছি। কাউকে দান করতে যাওয়াও সমস্য। দান করতেও শৈর্ষ লাগে। হট করে দান করা যায় না। বুড়ো বিড়ি টানা শেষ করে রিকশার সীট খেকে নামল। আমি উঠতে যাচ্ছি সে গভীর গলায় বলল, কইছি না, যায় না। ত্যক্ত করেন ক্যান?’

সে খালি রিকশা টেনে বেরিয়ে গেল। একটু সামনে গিয়ে দুজন যাত্রীও নিল। যে কোন কারণেই হোক আমাকে তার পছন্দ হয় নি। পাঁচশ টাকার চকচকে নোটটা তাকে দেয় গেলো না।

আমি ফার্মগেটের দিকে ঝওনা হলাম। নানান কিসিমের অভ্যন্তরীণ মানুষ ও জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। ভিক্ষার বিচিত্র টেকনিক দেখতে হলে ফার্মগেটের চেয়ে ভাল কোন

জায়গা হতে পারে না। একবার একজনকে পেয়েছিলাম ইংরেজিতে ভিক্ষা করেন।

‘Sir, I am a needy man, sir.’

‘Three school going daughters.’

‘Lost my job, presently pennyless.’

আমি বললাম, ইংরেজিতে ভিক্ষা করছেন কেন? বাংলা ভাষার জন্যে আমরা এত রক্ত দিয়েছি সে কি ইংরেজিতে ভিক্ষা করার জন্যে? ভিক্ষার জন্যে বাংলার চেয়ে ভাল ভাষা হতেই পারে না।

ইংরেজি ভাষার ভিক্ষুক চোখ মুখ কুঁচকে তাকাল। আমি বললাম, ফেরুয়ারি মাসেও কি ইংরেজিতে ভিক্ষা করেন? না—কি তখন বাংলা ভাষা?

আরেকজন আছেন, সন্দে চেহারা। সন্দে পোশাক। তিনি এসে খুবই আদবের সঙ্গে বলেন, ভাই কিছু মনে করবেন না — কয়টা বাজে! আমার ঘড়িটা বন্ধ।

ঁাকে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি ভদ্রলোকের সন্দৰ্ভায় মুঘল হয়ে যান — ঘড়ি দেখে সময় বলেন।

অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকাল মানুষ এমন হয়েছে সময় জিজ্ঞেস করলে রেগে যায়।

‘না না, ঠিক আছে।’

তখন ভদ্রলোক গলা নিচু করে বলেন — ভাই সাহেব, একটা মিনিট সময় হবে? দুটা কথা বলতাম।

যে সময় দিয়েছে সেই মরেছে। তার বিশ পঁচিশ টাকা খসবেই।

আরেক ভদ্রলোককে মাঝে মাঝে দেখা যায়। ব্যবরের পায়জ্ঞামা পাঞ্চাবি পরা। মুখে দাঢ়িগোফের জঙ্গল, হাতে বেনসনের প্যাকেট। ভদ্রলোকের পাঞ্চাবির পক্ষে সম্মতি আকবরের সময়কার একটা মোহর। দেড় ভরির মত ওজন। তাঁর গশ্প হচ্ছে — তিনি এককম মূলা ভর্তি একটা ঘটি পেয়েছেন। কাউকে জানাতে চাচ্ছেন না। জানলে সরকার সীজ করে নিয়ে যাবে। তিনি গোপনে মূলাগুলি বিক্রি করতে চান। তাই বলে সন্তুষ্য না। সোনার যা দাম সেই হিসেবে কিনতে হবে। কারণ খাঁটি সোনার মোহর। ভদ্রলোকের মূল ব্যবসার জ্ঞায়গা ফার্মগেট না। ফার্মগেটে তিনি অন্য উদ্দেশ্যে আসেন। উদ্দেশ্যটা আমার কাছে পরিষ্কার না।

পরিচিত ভিক্ষুকের কাউকেই পেলাম না তবে আশ্চর্যজনকভাবে আবদূর রশীদকে পেয়ে গেলাম। চশমা দেখে চিনলাম। চশমার ডট নেই, সূতা দিয়ে কানের সঙ্গে বাঁথা। হাতে এক তাড়া কাগজ নিয়ে এর-তার কাছে যাচ্ছেন। মনে হচ্ছে ডাঙ্কারের প্রেসক্রিপশন। হলুদ রংের বড় একটা খামও আছে। নির্বাণ একারে প্লেট।

‘রশীদ সাহেব না? কেমন আছেন? চিনতে পারছেন?’

ভদ্রলোক চশমার আড়াল থেকে পিট পিট করে তাকাচ্ছেন। চিনতে পারছেন কি-না বোঝা যাচ্ছে না।

‘চশমার ডট আবার ফেলে দিয়ে সূতা লাগিয়েছেন? এতে কি ভিক্ষার সুবিধা হয়?’

‘আপনাকে চিনতে পারছি না।’

‘চিনবেন না কেন? আমি বদরুল সাহেবের বক্তু। আপনার হাতে কি? প্রেসক্রিপশন? এতো পূরানো টেকনিকে গেলেন কেন?’

আবদুর রশীদ কঁপা গলায় বললেন, ছেলে মরণাপন্থ। লাঞ্সে পানি জমেছে। পুরিসি। প্রফেসর রহমান ট্রিটমেন্ট করছেন। বিশ্বাস না হলে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১২ নং ওয়ার্ডে যেতে পারেন।

‘অবস্থা খারাপ?’

আবদুর রশীদ জবাব দিলেন না। ক্রু দৃষ্টিতে আমাকে দেখছেন। আমি বললাম, টাকাপয়না কিছু জ্বোগাড় করতে পেরেছেন?

‘তা দিয়ে আপনার দরকার কি?’

‘দরকার আছে। আমি এককাপ চা খাব। চা এবং একটা সিগারেট। ত্রিশয় বুক ফেটে যাচ্ছে। হাতে একদম পয়সা নেই।’

‘পাঁচশ টাকার একটা নোট তো আছে।’

‘নোটটা আমার না। বুড়ো এক রিকশাওয়ালার নোট। তাকে ফিরত দিতে হবে। খাওয়াবেন এক কাপ চা? আপনার কাছে আমার চা পাওনা আছে। এদিন আপনাকে চা-সিঙ্গাড়া খাইয়ে ছিলাম।’

আবদুর রশীদ চা খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। শুকনো গলায় বললেন, চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবেন?

‘সিঙ্গাড়া খাওয়ান। তাহলে শোধবোধ হয়ে যাবে। আপনিও আমার কাছে ঝঙ্গি থাকবেন না। আমিও ঝঙ্গি থাকবো না।’

চায়ের সঙ্গে সিঙ্গাড়াও এল। আমি গলার স্বর নামিয়ে বললাম, রশীদ সাহেব, ভিক্ষার একটা ভাল টেকনিক আপনাকে শিখিয়ে দেই। কিছুদিন ব্যবহার করতে পারবেন, তবে এক জ্যায়গায় একবারের বেশি দুবার করা যাবে না। জ্যায়গা বদল করতে হবে। বলব?

রশীদ সাহেব চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। তাঁর চোখ-মুখ কঠিন। আমি খানিকটা ঝুঁকে এসে বললাম, ময়লা একটা গামছা শুধু পরবেন। সারা শরীরে আর কিছু থাকবে না। চোখে চশমা থাকতে পারে। আপনি করবেন কি — মধ্যবিস্ত বা নিম্নবিস্ত টাইপের লোকদের কাছে যাবেন। তিয়ে নিচু গলায় বলবেন — আমার কোন সাহায্য লাগবে না, কিছু লাগবে না, দোকান থেকে আমাকে শুধু একটা লুঙ্গ কিনে দেন। কেউ টাকা দিতে চাইলেও নিবেন না। দেখবেন দশ মিনিটের ভেতর আপনাকে লুঙ্গ কিনে দেবে। তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন — বড় লোকের কাছে কিছু চাইবেন না। আপনি গামছা পরে আছেন, না নেংটো আছেন তাতে ওদের কিছু যাই আসে না। কিন্তু যারা নিম্নবিস্ত তারা আপনাকে দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হবে। ওদের মনে হবে একদিন আপনার মত অবস্থা তাদেরও হতে পারে। তখন তারা ব্যস্ত হয়ে পড়বে লুঙ্গ কিনে দিতে। সেই লুঙ্গ আপনি

বিক্রি করে দেবেন। আবার আরেকটার ব্যবস্থা করবেন। বুঝতে পারছেন? মন দিয়ে কাজ করলে দৈনিক পাঁচ থেকে ছাটা লুঙ্গির ব্যবস্থা ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে।

আবদুর রশীদ কঠিন চোখে তাকালেন। আমি বিনোদ ভঙ্গিতে বললাম, ভাল বুকি দিয়েছি, এখন একটা সিগারেট খাওয়ান।

আবদুর রশীদ সিগারেট খাওয়ালেন না। চা-সিঙ্গাড়ার দাম দিয়ে উঠে চলে গেলেন।

বুড়ো রিকশাওয়ালা একজন পাওয়া গেল। বুড়ো হলেও তার গায়ে শক্তি সামর্থ ভালই। টেনে-রিকশা নিয়ে যাচ্ছে। গল্প জ্যাবার চেষ্টা করলাম। গল্প জমল না। শুধু জানালো তার আদি বাড়ি ফরিদপুর।

সাতটাকা ভাড়ার জ্যায়গায় পাঁচশ টাকা ভাড়া পেয়ে তার চেহারার কোন পরিবর্তন হল না। নির্বিকার ভঙ্গিতেই সে টাকাটা রেখে দিল। গামছা দিয়ে মুখ মুছল। মনে হয় তার বিশ্বিত হ্বার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে।

ম্যানেজার হায়দার আলি ঝা আমাকে দেখে আনন্দিত গলায় বললেন, সকাল থেকে আপনার জন্যে একটা মেয়ে বসে আছে। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, শেষে আমি আপনার ঘর খুলে দিলাম।

‘ঘর খুলে দিলেন কেন?’

‘মেয়েছেলে কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে?’

‘নাম কি মেয়ের?’

‘নাম জিজেস করি নাই। নাম জিজেস করলে বেয়াদবী হয়। সুন্দর মত মেয়ে।’

রূপা না-কি? রূপা হ্বার সন্তানা খুবই কম। সে এসে দীর্ঘ সময় বসে থাকবে না। গাড়ি থেকেই তার নামার কথা না। সে গাড়িতে বসে থাকবে — ড্রাইভারকে পাঠাবে খোঁজ নিতে। তাহলে কে হতে পারে?

ঘরে চুকে দেখি বাদলদের বাসায় যে মেয়েটিকে দেখেছিলাম — সে। পদার্থবিদ্যার ত্রিলিয়ন্ট ছাত্রী। মীরা কিংবা ইরা নাম।

আমি খুব সহজ ভাবে ঘরে চুকে বিদ্যুমাত্র আক্ষর্য না হওয়ার ভঙ্গি করে বললাম, কি খবর ইয়া, ভাল?

ইরা বসেছিল, উঠে দাঁড়াল। কিছু বলল না। তার মুখ কঠিন। ভুক কঢ়কে আছে। বড় ধরনের ঝগড়া শুরুর আগে মেয়েদের চেহারা এ রকম হয়ে যায়।

‘আমার এখানে কি মনে করে? গলায় কাঁটা?’

‘আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। আমি সেই সকাল এগারোটা থেকে বসে আছি।’

‘বোস। তারপর বল কি কথা?’

‘আপনার সঙ্গে আমার কথা ছিল যে আপনি আমাকে আপনি আপনি করে বলবেন।’

'আমার একদম মনে থাকে না। কোন কোন মানুষকে প্রথম দেখা থেকেই এত আপন মনে হয় যে শুধু তুমি বলতে ইচ্ছে করে।'

'দয়া করে মেয়েভুলানো কথা আমাকে বলবেন না। এই জাতীয় কথা আমি আগেও শুনেছি।'

'পাস্তা দেননি ?'

'পাস্তা দেয়ার কোন কারণ আছে কি ?'

'আছে। ছেলেরা নিতান্ত অপারগ হয়ে এইসব কথা বলে। প্রথম দেখাতে তো সে বলতে পারে না — "আমি আপনার প্রেমে হাবুড়ু খাচ্ছি।" বলতে লজ্জা লাগে। যে শোনে তারো খারাপ লাগে। কাজেই ঘুরিয়ে কথা বলার চেষ্টা করা হয়।'

'প্রেম বিষয়ক তত্ত্বকথা আমি শুনতে আসিনি। আপনার সঙ্গে আমার কিছু জরুরী কথা আছে। আমি কথাগুলি বলে চলে যাব।'

'অবশ্যই। একটু বসুন। ঠাণ্ডা হোন। ঠাণ্ডা হয়ে তারপর বলুন।'

ইয়া বসল না। দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ-মূখ যতটা কঠিন ছিল তারচেয়েও কঠিন হয়ে গেলো।

'কথাটা হচ্ছে বাদলদের বাড়িতে যে কাজের বুয়া আছে — তার একটা মেয়ে হারিয়ে গিয়েছিলি।'

'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। লুৎফা নাম।'

'সে না-কি আপনাকে বলেছিল তার মেয়েকে খুঁজে দিতে।'

'হ্যাঁ, বলেছিল। এখনো খোঝা শুরু করিনি। আসলে ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনি বলায় মনে পড়ল।'

'আপনাকে খুঁজতে হবে না। মেয়ে পাওয়া গেছে।'

'বাঁচা গেল। তিরিশ লক্ষ লোকের মাঝখান থেকে লুৎফাকে খুঁজে পাওয়া সমস্য হত।'

'আপনাকে সে যেদিন বলল, সেদিন দুপুরেই মেয়ে উপস্থিত। ব্যাপারটা যে পুরোপুরি কাকতালীয় তাতে কি আপনার কোন সন্দেহ আছে?'

'কোন সন্দেহ নেই।'

'আপনি নিশ্চয়ই দাবি করেন না যে আপনার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দিয়ে মেয়েকে নিয়ে এসেছেন?'

'পাগল হয়েছেন!'

'বুয়ার ধারণা আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দিয়ে কাজটা করা হয়েছে। বাদলেও তাই ধারণা।'

'কার কি ধারণা তাতে কি যায় আসে? মেয়েটাকে পাওয়া গেছে এটাই বড় কথা।'

ইয়া কঠিন গলায় বলল, কে কি ভাবছে তাতে অনেক কিছুই যায় আসে। এই ভাবেই সমাজে বুজুর্ক তৈরি হয়। আপনার মত মানুষরাই সোসাইটির ইকুইলিব্রিয়াম

নষ্ট করেন। বাদলের মাথা তো আপনি আগেই খারাপ করেছিলেন, এখন বুয়ার মাথাও খারাপ করলেন।

'তাই না-কি!'

'হ্যাঁ তাই। বাদলের মাথা যে আপনি কি পরিমাণ খারাপ করেছেন সেটা কি আপনি জানেন?'

'না, জানি না।'

'দু-একদিনের ভেতর একবার এসে দেখে যান। ব্রাহ্ম একটা ছেলে। বাবা-মা'র কত আশা ছেলেটাকে নিয়ে . . . আপনি তাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলেছেন। ফালতু বুজুর্কি। উন্টু উন্টু কথা। মহাপুরুষ মহাপুরুষ খেলা। রাতদুপুরে বাস্তায় হাঁটলেই মানুষ মহাপুরুষ হয়ে যায়?'

ইয়া রাগে কাপছে। মেয়েটা এতটা রেগেছে কেন বুঝতে পারছি না। এত রাগার তো কিছু নেই। আমার বুজুর্কিতে তার কি যায় আসে?

ইয়া বলল, আমি এখন যাব।

'চা-টা কিছু খাবেন না?'

'না। আপনি দয়া করে বাদলকে একটু দেখে যাবেন। ওর অবস্থা দেখে আমার কামা পাচ্ছে। মানুষকে বিভাস্ত করার জন্যে আসলে আপনার শাস্তি হওয়া উচিত। কঠিন শাস্তি।'

ইয়া গট গট করে বের হয়ে গেল। মেয়েটা বেশ সুন্দর। রেগে যাওয়ায় আরো সুন্দর লাগছে। যে রাগের সঙ্গে ধূণা মেশানো থাকে সেই রাগের সময় মেয়েদের সুন্দর দেখায় না। যে রাগের সঙ্গে সামান্যতম হলেও ভালবাসা মেশানো থাকে সেই রাগ মেয়েদের রূপ বাড়িয়ে দেয়। ইয়া কি সামান্য ভালবাসা আমার জন্যে বোধ করা শুরু করেছে? এটা আশংকার কথা। ভালবাসা বটগাছের মত। ক্ষুদ্র বীজ থেকে শুরু হয়। তারপর হঠাৎ একদিন ডালপালা মেলে দেয়, ঝুড়ি নামিয়ে দেয়।

ইয়ার ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। বাদলদের বাড়িতে ভুলেও যাওয়া যাবে না। ইয়া মেসের ঠিকানা বের করে চলে এসেছে কি ভাবে সেটাও এক রহস্য। ঠিকানা তার জ্ঞানার কথা না। এ বাড়ির কেউ জানে না।

রাতে খোত শিয়ে শুনি বদরল সাহেব আমার খাওয়া খেয়ে চলে গেছেন। মেসের বাবুটি খুবই বিরক্তি প্রকাশ করল।

'রোজ এই কাম করে। আফনের খাওন খায়।'

'ঠিকই করেন। আমি তাঁকে বলে দিয়েছি। এখন থেকে তিনিই যাবেন।'

'আপনি খাবেন না?'

'আমি কয়েকদিন বাইরে থাকব।'

ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমানোর আলাদা আনন্দ আছে। সেই আনন্দ পাবার উপায় হচ্ছে

— পেট ভর্তি করে পানি খেয়ে ঘুমুতে যাওয়া। পেট ভর্তি পানির কারণেই হোক কিংবা অন্য কারণেই হোক — নেশার ঘত হয়। যিমুনি আসে। ক্ষুধাত অবস্থায় ঘুমের সময়ের স্বপ্নগুলি হয় অন্যরকম। তবে আজ তা হবে না। রাতে না খেলেও দিনে খেয়েছি। ক্ষুধাত ঘুমের ব্রকপ বুঝতে হলে সারাদিন অভুক্ত থাকার পর পেট ভর্তি করে পানি খেয়ে ঘুমুতে যেতে হয়। নেশার ভাবটা হয় তখন।

বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় মদু টোকা পড়ল। বদরুল সাহেব মিহি গলায় ডাকলেন, হিমু ভাই। হিমু ভাই। আমি উঠে দরজা খুললাম।

বদরুল সাহেব লজ্জিত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে এক ঠোঙ্গা মুড়ি, আনিকটা গুড়। আমি বললাম, ব্যাপার কি বলুন তো?

‘শুনলাম আপনি খেতে গিয়েছিলেন। এদিকে আমি ভেবেছি আপনি আসবেন না...’

‘ও, এই ব্যাপার !’

‘খুব লজ্জায় পড়েছি হিমু ভাই। আপনার জন্যে মুড়ি এনেছি।’

‘ভাল করেছেন। আজ রাতটা উপোস দেব বলে ঠিক করেছি। মাঝে মাঝে আমি উপোস দেই। আপনি গুড়-মুড়ি খান। আমি মুড়ি খাওয়ার শব্দ শুনি।’

‘কিছু খাবেন না হিমু ভাই?’

‘না। তারপর ঐ দিন কি হল বলুন — পুলিশরা যত্ন করে খাইয়েছিল?’

‘যত্ন বলে যত্ন। এক হোটেলে নিয়ে গেছে। পোলাও, খাসির রেজালা, হাঁসের মাংস, সব শেষে দৈ মিষ্টি। এলাহী ব্যাপার। খুবই যত্ন করেছে। হাঁসের মাংসটা অসাধারণ ছিল। এত ভাল হাঁসের মাংস আমি আমার জীবনে খাইনি। বেশি করে রসুন দিয়ে ভূনা ভূন করেছে। এই সময়ের হাঁসের মাংসে স্বাদ হয় না। হাঁসের মাংস শীতের সময় খেতে হয়। তখন নতুন ধান ওঠে। ধান খেয়ে খেয়ে হাঁসের গায়ে চরি হয়। আপনার ভাবিও খুব ভাল হাঁস রাখতে পারে। নতুন আলু দিয়ে রাখে। আপনাকে একবার নিয়ে যাব। আপনার ভাবীর হাতের হাঁস খেয়ে আসবেন।’

‘কবে নিয়ে যাবেন?’

‘এই শীতেই নিয়ে যাব। আপনার ভাবীকে চিঠিতে আপনার কথা প্রায়ই লিখি তো। তারও খুব শুধু আপনাকে দেখাব। একবার আপনার অসুব হল — আপনার ভাবীকে বলেছিলাম দোয়া করতে। সে খুব চিন্তিত হয়েছিল। কোরান খত্তম দিয়ে বসে আছে। মেয়ে মানুষ তো, অল্পতে অস্থির হয়।’

‘আপনার চাকরির কি হল? শনিবারে হবার কথা ছিল না? গিয়েছিলেন?’

বদরুল সাহেব চুপ করে রইলেন। আমি বিছানায় উঠে বসতে বললাম, যাননি?

‘জি, গিয়েছিলাম। ইয়াকুব ভুলে গিয়েছিল।’

‘ভুলে গিয়েছিল?’

‘হ্যাঁ। সে তো একটা কাজ নিয়ে থাকে না। অসংখ্য কাজ করতে হয়। তাঁর পি-এ সে ফাইল দেয়নি। কাজেই ভুলে গেছে।’

‘এখন কি ফাইল দিয়েছে?’

‘এখন তো দেবেই। পি-এ-কে ডেকে খুব ধর্মকাধমকি করল। আমার সামনেই করল। বেচারার জন্যও মায়া লাগছিল। সে তো আর শক্তা করে আমার ফাইল আঠকে রাখেনি। ভুলে গেছে। মানুষ মাত্রেই তো ভুল হয়।’

‘ইয়াকুব সাহেব এখন কি বলছেন? কবে নাগাদ হবে?’

‘তারিখ-টারিখ বলেনি। আরেকটা বায়োডাটা জমা দিতে বলেছে।’

‘দিয়েছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘এবারো কি ফাইলের উপর আজেন্ট লিখে দিয়েছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘আবার কবে খোঁজ নিতে বলেছেন?’

‘বলেছে বার বার এসে খোঁজ নেবার দরকার নেই। ওপেনিং হলেই চিঠি চলে আসবে।’

‘সেই চিঠি কবে নাগাদ আসবে তা কি বলেছে?’

‘খুব তাড়াতাড়ি আসবে। আমি আমার অবস্থার কথাটা বুঝিয়ে বলেছি। চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেললাম যে অন্যের খাবার খেয়ে বেঁচে আছি। শুনে সে খুবই মন খারাপ করল।’

‘বুলেন কি করে যে মন খারাপ করেছে? মুখে কিছু বলেছে?’

‘কিছু বলেনি। চেহারা দেখে বুবেছি।’

‘আমার কি মনে হয় জানেন বদরুল সাহেব, আপনার অন্যান্য জায়গাতেও চাকরির চেষ্টা করা উচিত। ইয়াকুব সাহেবের উপর আমার তেমন ভরদা হচ্ছে না।’

‘ভরসা না হবার কিছু নেই হিমু ভাই। স্কুল জীবনের বদ্ধ। আমার সমস্যা সবটাই জানে। আমার ধারণা এক সপ্তাহের মধ্যেই চিঠি পাব।’

‘যদি না পান?’

‘না পেলে অফিসে গিয়ে দেখা করব। বার বার যেতে লজ্জাও লাগে। নানান কাজ নিয়ে থাকে। কাজে ডিস্টাৰ্ব হয়।’

ঘর অক্ষকার। কচ কচ শব্দ হচ্ছে। বদরুল সাহেব মুড়ি খাচ্ছেন।

‘হিমু ভাই !’

‘জি।’

‘ফ্রেস মুড়ি। খেয়ে দেখবেন?’

‘আপনি খান।’

‘মুড়ির আসল স্বাদও পাওয়া যায় শীতকালে। আপনার ভাবী আবার মুড়ি দিয়ে

মোয়া বানাতে পারে। কি জিনিস তা না খেলে বুঝবেন না।'

'একবার খেয়ে আসব।'

'অবশ্যই খেয়ে আসবেন।'

'বদরুল সাহেব।'

'ছি।'

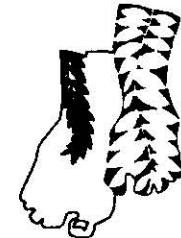
'আমি কিছুদিন অন্য জায়গায় গিয়ে থাকব। কেউ আমার খোজে এলে বলে দেবেন মেস ছেড়ে দিয়েছি। মিথ্যা কথা বলতে পারেন তো?'

'আপনি বললে — মিথ্যা বলব। আপনার জন্যে করব না এমন কাজ নাই। শুধু মানুষ খুন্টা পারব না।'

মানুষ খুন্ট করতে হবে না শুধু একটু মিথ্যা বলবেন। ইরা নামের একটা মেয়ে আমার খোজে আসতে পারে, তাকে বলবেন আমি সুন্দরবনে চলে গেছি। মাস্থানিক থাকব। তবে রূপা এলে আমি কোথায় আছি সেই ঠিকানা দিয়ে দেবেন।'

'ঠিকানাটা কি?'

'আমার এক দূর সম্পর্কের খালা আছে। রেশমা। গুলশানে থাকে। গুলশান দুই নম্বর। বাড়ির নাম গনি প্যালেস। এ প্যালেসে সপ্তাহখানিক লুকিয়ে থাকব। না থাক, তেকেও সুন্দরবনের কথাই বলবেন।'



গুলশান এলাকায় সবচে 'বড়, সবচে' কৃৎসিত বাড়িটা রেশমা খালার। খালু সাহেবের গনি মিয়ার সিঙ্গুলার সেসব ছিল অকল্পনীয়। তিনি সম্ভা গণ্ডার সময়ে গুলশানে দু'বিঘা ভূমি কিনে ফেলে রেখেছিলেন। তার বেকুবির উদাহরণ হিসেবে তখন এই ঘটনার উল্লেখ করা হত। যার সঙ্গেই দেখা হত রেশমা খালা বলতেন, বেকুবটার কাণ শুনেছ? জঙ্গল কিনে বসে আছে।

খালু সাহেবের চেহারা বেকুবের মতই ছিল। অন্যের কথা শোনায় সময় আপনাআপনি মুখ হা হয়ে যেত। ব্যবসা বিষয়ে যেসব কথা বলতেন সবই হাস্যকর বলে মনে হত। যে বছর দেশে পেয়াজের প্রচুর ফলন হল এবং পেয়াজের দাম পড়ে গেল সে বছরই তিনি পেয়াজের ব্যবসায় চলে এলেন। ইতিয়া থেকে পেয়াজ আনার জন্য এলাসি খুলালেন। অন্য ব্যবসায়ীরা হাসল। হাসারই কথা। রেশমা খালা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি না—কি বেকুবের মত পিয়াজের ব্যবসায় নামছ? যত দিন যাচ্ছে তোমার বুদ্ধি—শুরু তো ততই চলে যাচ্ছে। আগে মাঝে মধ্যে হা করে থাকতে, এখন দেখি সারাক্ষণই হা করে থাক। পেয়াজের ব্যবসার এই বুদ্ধি তোমাকে কে দিল?

'কেউ দেয় নাই। নিজেরই বুদ্ধি। পেয়াজের ফলন খুব বেশি হয়েছে তো, চার্ষী ভাল দাম পায় নাই। এই জন্য আগামী বছর পেয়াজের চাষ হবে কম। পেয়াজের দাম হবে আকাশছোঁয়া।'

'তোমার মাথা!'

'দেখ না কি হয়।'

গনি সাহেব যা বললেন তাই হল। পরের বছর পেয়াজ দেশে প্রায় হলই না।

রেশমা খালা হতভয়। তিনি বলে বেড়াতে লাগলেন, বেকুব মানুষ তো। বেকুব মানুষের উপর আঞ্চাহার রহমত থাকে। যে ব্যবসা—ই করে দু'হাতে টাকা আনে। টাকা ব্যাংকে রাখার জায়গা নেই, এমন অবস্থা।

রেশমা খালার আফসোসের সীমা নেই — বেকুব স্বামী টাকা রোজগার করাই শিখেছে, খরচ করা শিখেনি। তিনি আফসোসের সঙ্গে বলেন, টাকা খরচ করতে তো বুদ্ধি লাগে। বুদ্ধি কোথায় যে খরচ করবে? খালি জমাবে।

গনি সাহেব মাছ-গোশত এক সঙ্গে খান না। ছেটবেলায় তাঁর মা বলেছেন, মাছ-

গোশত এক সঙ্গে খেলে পেটের গওগোল হয়। সেটাই মাথায় রয়ে গেছে। গাঢ়িতে চড়তে পারেন না, বেবী টেক্সিতেও না। পেটোলের গন্ধ সহ্য হয় না। বমি হয়ে যায়। লোকজনের গাড়ি থাকে। গনি সাহেবের আছে রিস্বা। সেই রিক্ষার সামনে—পেছনে ইংরেজিতে লেখা “Private”

সেই রিক্ষায় কোথাও যেতে হলে রেশমা খালার মাথা কাটা যায়। সাধারণ রিক্ষায় চড়া যায়, কিন্তু ‘প্রাইভেট’ লেখা রিক্ষায় কি চড়া যায়? লোকজন কেমন কেমন চোখে তাকায়।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য রেশমা খালা গাড়ি কিনলেন। খালু সাহেব নাকে অডিকোলন ভেজানো কুমাল চাপা দিয়ে কয়েকবার সেই গাড়িতে চড়লেনও, তারপর আবার ফিরে গেলেন প্রাইভেট রিক্ষায়। তাঁতে তাঁর ব্যবসা—বাণিজ্যের কোন অনুবিধি হল না। ব্যবসা—বাণিজ্য হ্রস্ব করে বাড়তে লাগল। কাপড়ের কল দিলেন, গামেন্টস ইন্ডাস্ট্রি করলেন।

রেশমা খালার শুধু আফসোস — খালি ঢাকা, আর ঢাকা। কি হবে ঢাকা দিয়ে? একবার দেশের বাইরে যেতে পারলাম না। এমন এক বেকুব সোকের হাতে পড়েছি, আকাশে প্লেইন দেখলে তার বুক ধড়ফড় করে। এই লোককে নিয়ে জীবনে কোনদিন কি বাহারে যেতে পারব? কোন দিন পারব না। লোকে দুদের শপিং করতে সিঙ্গাপুর যায়, ব্যাংকক যায়। আর আমি কোটিপতির বউ, আমি যাই গাউচিয়ায়।

খালু সাহেবের ঘৃত্যুর পর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন যে কি পরিমাণ হয়েছে সেটা তাঁর বাড়িতে চুকে দেখলাম।

পুরোন বাড়ি ভেঙে কি ছলন্তুল করা হয়েছে। মার্বেল পাথরের সিঁড়ি। ময়লা জুতা পায়ে সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে ভয় লাগে। ঘরে ঘরে বাড়বাতি। ড্রয়িংকুমে চুকে আমি হতভয় গলায় বললাম, সর্বনাশ! রেশমা খালা আনন্দিত গলায় বললেন, বাড়ি বিনোদনের পর তুই আর আসিসনি, তাই না?

‘না। তুমি তো ইন্সপুরী বাণিয়ে ফেলেছ’

‘আর্কিটেক্টা ভাল পেয়েছিলাম। ঢাকা অনেক নিয়েছে। ব্যাটা কাজ জানে, ঢাকা তো নিবেই। ভেতরের সব কাজ দিয়েছি ইন্টারনাল ডিজাইনারকে। আমেরিকা থেকে পাশ করা ডিজাইনার। ফার্নিচার—টানিচার সব তার ডিজাইন। দেয়ালে যে পেইনটিংগুলি দেখছিস সেগুলিও কোন্টা কেখার বসবে সেই ঠিক করে দিয়েছে।

‘এই বাড়িতে তো খালা আমি থাকতে পারব না। দয় বন্ধ হয়ে যাব। এখনি শুসকষ্ট হচ্ছে।’

রেশমা খালা আনন্দিত গলায় বললেন, তোর ঘর দেখিয়ে দি। ঘর দেখলে তুই আর যেতে চাইবি না। গেস্টরুম আছে দুটা। তোর মেটা পছন্দ সেটাতে থাকবি। একটায় ভিস্টোরিয়ান ফার্নিচার, অন্যটায় মডার্ন। তোর কোন ধরনের ফার্নিচার পছন্দ? দুটা ঘরই দেখ। মেটা ভাল লাগে। দুটাতেই এ্যাটাচড বাথ। দুটাতেই এসি।

‘এত বড় একটা বাড়িতে একা থাকো?’

‘একা তো থাকতেই হবে, উপায় কি? গোষ্ঠির আত্মীয়বন্ধন এনে চুকাব? শেষে ঘুমের মধ্যে যেরে যেখে যাবে। সবাই আছে ঢাকার ধন্দায়। মানুষ দেখলেই আমার ভয় লাগে।’

‘আমাকে ভয় লাগছে না?’

‘না, তোকে ভয় লাগবে কেন? শোন, কোন বেলা কি যেতে চাস বাবুচিকে বলবি। যেখে দেবে। দুঃস্ফূন বাবুচি আছে। ইংলিশ ফুডের জন্যে একজন, বাঙালী ফুডের জন্যে একজন।’

‘চাইনীজ ফুড কে রাঁধে?’

‘ইংলিশ বাবুচিই রাঁধে। ও চাইনীজ ফুডের কোর্সও করেছে। রাতে কি খাবি—চাইনীজ?’

‘তুমি যা খাও তাই খাবি?’

‘তোর যখন চাইনীজ ইচ্ছা হয়েছে তখন চাইনীজই খাব। দাঢ়া, বাবুচিকে বলে দি। এই বাড়ির মজা কি জানিস — কথা বলার জন্যে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে হবে না। ইন্টারকম আছে। বোতাম টিপলেই হল। আয়, তোকে ইন্টারকম ব্যবহার করা শিখিয়ে দি।’

ইন্টারকম ব্যবহার করা শিখলাম। বাথরুমের গরম পানি, ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা শিখলাম। এসি চালানো শিখলাম। রিমোট কন্ট্রোল এসি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে বোতাম টিপে এসি অন করা যায়। ঘর আপনাআপনি ঠাণ্ডা-গরম হয়।

‘তোর গান-বাজনার শখ আছে? একটা মিউজিক কুম রয়েছে, ক্যাসেট ডেক, সিডি প্লেয়ার সব আছে।’

‘আর কি আছে?’

‘প্রেমার কুম আছে।’

‘সেটা কি?’

‘প্রার্থনা ঘর। নামাজ পড়তে ইচ্ছা হলে নামাজ পড়বি। দেখবি? দেখতে হলে অঙ্গ করে ফেল। অঙ্গ ছাড়া নামাজ ঘরে ঢেকা নিবেধ।’

‘নামাজ় ঘরে কি আছে? জ্বালানামাজ, টুপি?’

‘আবে না। জ্বালানামাজের দরকার নেই। মেঝে সবুজ মার্বেলের। ঝোঁজ একবার সাধারণ পানি দিয়ে মোছা হয়, তারপর গোলাপ জল মেশানো পানি দিয়ে মোছা হয়। চারদিকে কোরান শরীফের বিভিন্ন আয়াত ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছি। ইসলামিক আর্ট ডিজাইন। এই ডিজাইন আবার অন্য একজনকে দিয়ে করিয়েছি।’

‘নামাজ পড়ছ?’

‘শুরু করব। ছোটবেলায় কোরান শরীফ পড়া শিখেছিলাম, তারপর ভুলে গেছি। কথায় বলে না — অনভ্যাসে বিদ্যা নাশ। এই হয়েছে। একজন মওলানা রেখে কোরান

শৰীফ পড়া শিখে তারপর নামাজ ধরব। আয়, নামাজঘর দেখে যা। বাংলাদেশে এই জিনিস আর কারো ঘরে নাই। এখন আবার অনেকেই আমার ডিজাইন নকল করছে। প্রেয়ার কুম বানাচ্ছে। নকলবাজের দেশ। ভাল কিছু করলেই নকল করে ফেলে।'

'তোমার বাড়িতে বার নেই খালা ?'

'আছে, থাকবে না কেন ? বার ছাড়া কোন মডার্ন বাড়ির ডিজাইন হয় ? ছাদের চিলেকোঠায় বার। তোর আবার ঐসব বদ অভ্যাস আছে নাকি ? থাকলে ভুলে যা। আমার বাড়িতে বেলেজাপনা চলবে না। যা, অঙ্গু করে আয়, তোকে নামাজ ঘর দেখিয়ে আনি।'

অঙ্গু করে নামাজঘর দেখতে গেলাম। খালা মুঢ় গলায় বললেন, ঘরে কোন বাস্তু বা টিউব লাইট দেখছিস ?'

'না !'

'তারপরেও ঘর আলো হয়ে আছে না ?'

'হ্যাঁ !'

'এর নাম কনসিলড লাইটিং। ধাঁদিকের দেয়ালে দেখ একটা সুইচ, টিপে দে ?'

'টিপলে কি হবে ?'

'টিপে দেখ না। বিসমিল্লাহ বলে টিপবি !'

আমি বিসমিল্লাহ বলে সুইচ টিপে আতঙ্ক নিয়ে অপেক্ষা করছি। আমার ধারণা, সুইচ টেপামাত্র নামাজঘর পরোপুরি পশ্চিম দিকে স্থুরবে। তা হল না। যা হল সেটাও কম বিস্ময়কর না। কোরান তেলাওয়াত হতে লাগল।

রেশমা খালা বললেন, পুরো কোরান শৰীফ রেকর্ড করা আছে। একবার বোতাম টিপে দিলে অটোমেটিক কোরান খতম হয়ে যায়।

'সেই কোরান খতমের সোয়াব তো তুমি পাও না, সোয়াব পায় তোমার ক্যাসেট রেকর্ডার। এই ক্যাসেট রেকর্ডারের বেহেশতে যাবার খুবই উচু সন্তাননা দেখা যাচ্ছে।'

'খবরদার, নামাজঘরে কোন ঠাট্টা-ফাজলামি করবি না !'

নামাজঘরে কোরান পাঠ চলতে লাগল। খালা আমাকে ছাদের চিলেকোঠায় বার দেখাতে নিয়ে গেলেন। শ্বেত পাথরের কাউটার টেবিল। পেছনে আলমারী ভর্তি নানা আকারের এবং নানা রঙের বোতল বিক্রিক করছে।

'কালেকশন কেমন, দেখেছিস ?'

'হ্যাঁ। আকেল শুভূম অবস্থা। শুভূম আকেল শুভূম না, একই সঙ্গে বে-আকেল শুভূম !'

'বে-আকেল শুভূম আবার কি ?'

'কথার কথা আব কি ! করেছ কি তুমি ? দুনিয়ার বোতল জোগাড় করে ফেলেছ !'

'খাওয়ার লোক নেই তো। শুভূম জমছে !'

'তোমার এখানে সবচে দামী বোতল কোনটা খালা ?'

'পেটমোটা বোতলটা — ঐ যে দেখে মনে হচ্ছে মাটির বোতল। পঞ্চাশ বছরের পুরানো রেড ওয়াইন। ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের বিশেষ বিশেষ উৎসবে এই জিনিস খাওয়া হয়।'

'দাম কত তা তো বললে না !'

'দাম শোনার দরকার নেই। দাম শুনলে তুই ভিৰমি খাবি !'

'এম্বিতেই ভিৰমি খাচ্ছি। আজ আব আমার ভাত খেতে হবে না। ভিৰমি খেয়ে পেট ভরে গেছে !'

আনন্দে খালাৰ মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল। আমাৰ মুখ হয়ে গেল অঙ্ককাৰ। এক সপ্তাহ এ বাড়িতে থাকা যাবে না। আজই পালাতে হবে। রাতটা কোনমতে পার কৰে সকালে সূর্য ওঠাৰ আগেই 'হ্যাপিশ'।

'আয়, লাইব্ৰেরি ঘৰ দেবি !'

'আবাৰ লাইব্ৰেরি ঘৰও আছে ?'

'বলিস কি ! লাইব্ৰেরি ঘৰ থাকবে না ? লাইব্ৰেরি ঘৰ পুৱোটা কাঠেৰ করেছি। মেঝেও কাঠেৰ। সব বকম বইপত্ৰ আছে; ঘণ্টাৰ পৰ ঘণ্টা তুই বই পড়ে কাটাতে পাৰবি। নিউ মার্কেটেৰ এক দোকানেৰ সঙ্গে কট্টাণ্ট কৰে রেখেছি — ভাল ভাল বই এলৈহ পাঠিয়ে দেয়। লাইব্ৰেরি ঘৰে কম্পিউটাৰ বসিয়েছি। তুই কম্পিউটাৰ চলাতে জানিস ?'

'না !'

'আমিও জানি না। যাদেৱ কাছ থেকে কিনেছি ওদেৱ বলা আছে, অবসৱ পেলেই খবৰ দেব, ওৱা এসে শিৰিয়ে দেবে !'

'অবসৱ পাছ না ?'

'অবসৱ পাব কোথায় ? সকালটায় একাতু অবসৱ থাকে। দুপুৰে খাওয়াৰ পৰ ঘুমতো যাই — সক্ষ্যা পৰ্যন্ত ঘুমাই। সারারাত জেগে থাকি — দুপুৰে না ঘুমালে চলবে কেন ?'

'সারারাত জেগে থাক কেন ?'

'ঘুম না হলে জেগে না থেকে কৰব কি ?'

'ঘুম হয় না ?'

'না !'

'ডাঙ্কাৰ দেখিয়েছ ?'

'ডাঙ্কাৰেৰ পেছনে জলেৱ মত টাকা খৰচ কৰেছি। এখনো কৰছি। এখনো চিকিৎসা চলছে। সাইকিয়াট্রিশ্ট চিকিৎসা কৰছেন !'

'তাৱা কিছু পাচ্ছে না ?'

'পাচ্ছে কি পাচ্ছে না ওৱাই জানে। ওদেৱ চিকিৎসায় লাভ হচ্ছে না। এখন তুই হলি ভৱসা।'

‘আমি ভৱসা মানে? আমি কি ডাঙ্গার না-কি?’

‘ডাঙ্গার না হলেও তোর নাকি অনেক ক্ষমতা। সবাই বলে। তুই আমাকে রাতে ঘুমের ব্যবস্থা দে। তুই যা চাইবি তা-ই পাবি। ওয়াইনের এই বোতলটা তোকে না হয় দিয়ে দেব।’

পঞ্জাশ বছরের পুরানো মদের বোতল পাব এই আনন্দ আমাকে তেমন অভিভূত করতে পারল না। আমার ভয় হল এই ভেবে যে রেশমা খালা আমার উপর ভর করেছেন। সিদ্ধাবাদের ভূত সিদ্ধাবাদের উপর একা চেপেছিল। রেশমা খালা আমার উপর একা চাপেন নি, তাঁর পুরো ঝাড়ি মিয়ে চেপেছেন। একদিনেই আমার চ্যাপ্টা হয়ে যাবার কথা। চ্যাপ্টা হওয়া শুরু করেছি।

‘হিমু!’

‘ছি!'

‘আমার ব্যাপারটা কখন শুনবি?’

‘তোমার কোন ব্যাপার?’

‘ওমা, একস্কণ কি বললাম — রাতে শুয়ু না হওয়ার ব্যাপারটা।’

‘একসময় শুনলেই হবে। তাড়াতো কিছু নেই।’

‘এখন তুই কি করবি?’

‘বুঝতে পারছি না। নিজের ঘরে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব বলে ভাবছি। যে বিছানা বানিয়েছ শুতে সাহসও হচ্ছে না।’

‘রেশমা খালা বললেন, বিছানা এমন কিছু না। সাধারণ ফোমের তোষক। তবে বালিশ হচ্ছে পাখির পালকের।’

‘বল কি?’

‘শুব একপেনসিল বালিশ। জ্যাণ্ট পাখির পাখা থেকে এইসব বালিশ তৈরি হয়। মরা পাখির পালকে বালিশ হয় না।’

‘একটা পালকের বালিশের জন্যে কটা পাখির পালক লাগে?’

‘কি করে বলব কটা — কুড়ি পঁচিশটা নিষ্পয়ই লাগে।’

‘একটা বালিশের জন্যে তাহলে পঁচিশটা পাখির আকাশে ওড়া বন্ধ হয়ে গেলো?’

‘আখ্যাতিক ধরনের কথা বলবি না তো হিমু। এইসব কথা আমার কাছে ফাঁজলামীর মত লাগে।’

‘ফাঁজলামীর মত লাগলে আর বলব না।’

‘যা, তুই রেস্ট নে। চা কফি কিছু খেতে চাইলে ইন্টারকমে বলে দিবি।’

‘তুমি কি বেরছ?’

‘হ্রি। বললাম না সকালে আমি একটু বের হই। দিন রাত ঘরে বসে থাকলে দম বন্ধ হয়ে আসবে না। তুই তো এখন আর বের হবি না?’

‘না।’

‘তাহলে তালা দিয়ে যাই।’

আমি অবাক হয়ে বললাম, তালা দিয়ে যাবে মানে?

খালা আমার চেয়েও অবাক হয়ে বললেন, তুই আমার মূল বাড়িতে থাকবি তোকে তালা দিয়ে যাব না? লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস চারদিকে।

‘ঘরে যদি আগুন টাগুন লেগে যাব তখন কি হবে?’

‘খামাখা আগুন লাগবে কেন? আর যদি লাগে প্রতি ফ্লোরে ফায়ার এক্সটিংগুইসার আছে।’

‘তালা দেয়া অবস্থায় কতক্ষণ থাকব।’

‘আমি না আসা পর্যন্ত থাকবি। আমি তো আর সারাজীবনের জন্যে চলে যাচ্ছি না। ঘট্টখানিক ঘোরাঘুরি করে চলে আসব। সামান্য কিছুক্ষণ তালাবন্ধ থাকবি এতেই মুখ ঢোক শুকিয়ে কি করে ফেলেছিস।’

‘খালা, আমি হচ্ছি মৃক্ত মানুষ। এটাই সমস্যা।’

‘বিছানায় শুয়ে বই টই পড়, টিভি দেখ। আমি তোকে কফি দিতে বলে যাচ্ছি।’

আমি বিছানায় শুয়ে শুয়েই ঘটাং ঘটাং শব্দে তালা দেয়ার আওয়াজ পেলাম। এ বাড়ির সব কিছু আধুনিক হলেও তালাগুলি সম্ভবত মাঝাতার আমলের। বড় শব্দ হয়।

পালকের বিছানায় মাথা রেখে শুয়ে আছি। আমাকে কফি দিয়ে দেছে। চাইনীজ খাবার কি খাব বাবুটি জ্ঞানতে এসেছিল, হাতে নেট-বুক, পেসিল। আমি গঙ্গীর গলায় বলেছি আরশোলা দিয়ে হট এন্ড সাওয়ার করে একটা সুস্প খাব। চাইনীজরা শুনেছি আরশোলার সুস্প শুব সখ করে খাব। আমি কখনো খেয়ে দেখিনি।

বাবুটি হতভন্ন গলায় বলল, স্যারের কথা বুঝতে পারলাম না। কিসের সুস্প?

‘ককরোচ সুস্প। সঙ্গে মাশকুম দিতে পারেন, বেবী কর্ণ দিবেন। সয়ামস অঙ্গ দিবেন। আরশোলার গঞ্জ মারার জন্যে যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু, বেশি না কমও না।’

‘আমি স্যার আসলেই আপনার কথা বুঝতে পারছি না।’

‘বুঝতে না পারলে বিদায় হয়ে যান।’

‘ছি আচ্ছা, স্যার।’

তালাবন্ধ বাড়িতে পড়ে আছি। আইনস্টাইনের বিওরি অব রিলেটিভিটি কাজ করতে শুরু করেছে। সময় থেমে গেছে। টাইম ডাইলেশন। তালাবন্ধ অবস্থায় যে এর আগে থাকিনি তা না। হাজৰতে কাটানো রাতের সংখ্যা কম না। তবে হাজৰত তালাবন্ধ থাকবে এটা স্থীরূপ সত্য বলে খারাপ লাগে না। তালা খোলা অবস্থায় হাজৰতে বসে থাকাটা বরং অস্বাক্ষির। কিন্তু স্বর্গপুরীতে তালাবন্ধ অসহনীয়।

শুয়ে শুয়ে ভাবছি বেহেশত কেমন হবে? সেখানেও কি এ রকম তালা সিস্টেম থাকবে। না-কি বেহেশতবাসীরা মৃক্ত স্থায়ী অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে পারবে। কারো ইচ্ছা

হল সে দোজখে তার কোন পুরানো বক্তুর সঙ্গে দেখা করে এল। বেহেশতের বর্ণনা ভাল মত ছেমে নিতে হবে। খালার নামাজ ঘরে প্রচুর ধর্মের বই-টই আছে। সেখানে বেহেশত সম্পর্কে কি লেখা আছে পড়তে হবে।

কফি খাইছ, কফিতে কোন স্বাদ পাইছ না। স্বাদ যেমন নেই, গন্ধও নেই। একটু পর পর চোখ চলে যাছে ঘড়ির দিকে। ঘড়ি মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি বক্ষ হয়ে গেছে।

আমার বিশ্যাত বাবা আমাকে বন্দি থাকার ট্রেনিং অতি শৈশবে দিয়ে দিয়েছিলেন। তার কাছে মনে হয়েছিল মহাপুরুষ বানানোর জন্যে এই ট্রেনিং অতি জরুরি। বন্দি না থাকলে 'মৃত্তি'র স্বরূপ বোঝা যায় না। কাজেই একদিন আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে দিলেন — তখন আমি ক্লাস ফোরে পড়ি। যতটা অবাক হওয়ার কথা ততটা হলাম না। বাবার পাগলামীর সঙ্গে ততদিনে পরিচিত হয়ে পড়েছি। আমার ধারণা সঞ্চ্যার পর পর বাবা বাড়ি ছেড়েই চলে গেলেন। যাবার সময় মেইন সুইচ অফ করে দিলেন। একেবারে কবরের অঙ্ককার। এটা ছিল আমার বাবার ভয় জয় করা ট্রেনিং-এর প্রাথমিক অংশ। তাঁর ডায়েরীতে তিনি লিখেছিলেন —

"অদ্য রজনীতে হিমালয়কে ভয় জয় করিবার প্রস্তুতিসূচক ট্রেনিং  
দেওয়া হইবে। মানুষের প্রধান ভয় অঙ্ককারকে। যে অঙ্ককারের  
শ্রৃতি সে অন্য কোন স্বুবন হইতে লইয়া আসিয়াছে। অঙ্ককারকে  
ভয় করার অর্থ সমস্ত ভয় জয় করা। অদ্যকার অঙ্ককার জয়  
করা বিষয়ক প্রাথমিক ট্রেনিং হিমালয় কিভাবে গ্রহণ করিবে  
বুঝিতে পারিতেছি না। এই শক গ্রহণ করিবার মানসিক শক্তি কি  
তাহার আছে? বুঝিতে পারিতেছি না। কাহাকেও বাহির হইতে  
দেখিয়া তাহার মানসিক শক্তি সম্পর্কে ধারণা করা যায় না। সেই  
দিয়ে দৃষ্টি প্রকৃতি মানব সম্প্রদায়কে দেয় নাই . . ."

আমি ইটারকম টিপে বাবুটিকে ডাকলাম। ইটারভু নেয়ার ভঙ্গিতে বললাম, কি নাম?

'ইটিস !'

শুরুতে তাকে আপনি করে বলেছিলাম, এখন তুমি।

'শেন ইটিস ! এ বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে? বাথরুম থেকে  
পাইপ যেয়ে নেমে পড়া বা এ জাতীয় কিছু ?'

'ছ্বি না !'

'ছাদে উঠে, ছাদ থেকে অন্য ছাদে লাফিয়ে যাওয়া যায় না ?'

'ছ্বি-না !'

'টেলিফোন নিয়ে আস। দমকল অফিসে টেলিফোন করে দি। ওরা তালা খুলে  
উঠার করবে।'

'টেলিফোন নাই স্যার !'

'টেলিফোন নাই মানে ?'

'এই বাড়িতে সব আছে টেলিফোন নাই। টেলিফোনে লোকজন বিরক্ত করে।  
ম্যাডামের ভাল লাগে না।'

'ও, আচ্ছা !'

'স্যার, আরেক কাপ কফি এনে দেই। চিন্তার কিছু নাই ম্যাডাম চলে আসবেন।  
উনি বেশীকণ বাড়ির বাইরে থাকেন না। চলে আসেন। কফি দিব স্যার ?'

'দাও !'

বাবুটি কফি এনে দিল। আমি কফি খেয়ে রেশমা খালার অপেক্ষা করতে করতে  
এক সময় ঘূমিয়ে পড়লাম। সেই ঘূম যখন ভাঙল তখন দেখি রাত হয়ে গেছে। ঘর  
অঙ্ককার।

'কিরে, ঘূম ভেঙ্গেছে?"

রেশমা খালা ঘরে চুকে বাতি ছালালেন। তিনি মাথার নকল চুল খুলে ফেলেছেন।  
তাঁকে মোটামুটি বীভৎস দেখাচ্ছে। তাঁর মাথার আদি চুলের এই অবস্থা কে জানত।  
কিছু আছে কিছু নেই। যেখানটায় নেই সেখানটার মাথার হলুদ চামড়া চকচক করছে।

'ঘরে ফিরে দেখি তুই মরার মত ঘূমিছিস। তুই আর ঘূম ভাঙলাম না। ঘূমের মূল্য  
কি তা আর কেউ না জানুক আমি তো জানি। এতক্ষণ ধরে কেউ ঘূমতে পারে তাও  
জানতাম না। তোর কোন অসুখ বিসুখ নেই তো ?'

'কটা বাজে খালা ?'

'ন্টার কাছকাছি। তুই এক নাগড়ে প্রায় দশবচন্তা ঘূমলি। কিষে লেগেছে নিশ্চয়ই।  
হাত-মুখ ধূয়ে আয় ভাত খাই !'

আমি উঠলাম। শাস্তি গলায় বললাম, ভাত খেয়েই আমি একটু বেরুব খালা।

'বের হতে চাইলে বের হবি। আমি কি তোকে আটকে রেখেছি না—কি? বাবুটি  
বলছিল তালা দিয়ে যাওয়ায় তুই নাকি অস্থির হয়ে পড়েছিলি। আশ্র্য। তুই কি  
ছেলেমানুষ না—কি? তুই আবার তাকে বলেছিস তেলাপোকার স্যুপ খেতে চাস। হি হি  
হি। বাবুটিটা মোকা টাইপের, ও সত্যি ভেবে বসে আছে। ঠাট্টা বুঝতে পারেনি।'

'তেলাপোকার স্যুপ তৈরি করেছে? আমি ঠাট্টা করিনি। আসলেই খেতে  
চেয়েছিলাম।'

'তুই দেখি আচ্ছা পাগল। আয় খেতে আয়। খেতে খেতে আমার ভয়ংকর গল্পটা  
বলব। তুই আবার চারদিকে বলে বেড়াবি না।'

ডাইনিং রুম ছাড়াও ছেট্ট একটা খাবার জায়গা আছে। শ্রেত পাথরের টেবিলে দুটা  
মাত্র চেয়ার। মোমবাতি ঝালিয়ে ক্যান্ডেল লাইট ডিনার। টেবিলে নানান ধরনের পদ

সাজনো।

বাবুটি পাশে দাঢ়িয়ে ছিল। খালা বললেন, ‘তুমি চলে যাও, তোমাকে আর লাগবে না। খাওয়া শেষ হলে ঘন্টা খাজাব তখন সব পরিষ্কার করবে।’

‘ঘন্টার ব্যবস্থা আছে?’

‘আছে, সব ব্যবস্থাই আছে। খাওয়া শুরু কর। বাবুটির রান্না কেমন বলবি। রান্না পচ্ছদ না হলে ব্যাটাকে বিদেয় করে দেব। ব্যাটার চোরের চাউনি ভাল না। সৃপটা কেমন?’

‘ভাল। খুব ভাল।’

‘তুই তো এখনো মুখেই দিস নি। মুখে না নিয়েই বলে ফেললি ভাল?’

‘গঙ্গে গঙ্গে বলে ফেলেছি। চাইনীজ খাবারের আসল স্বাদ গঙ্গে। গঙ্গ ঠিক আছে। বাবুটিকে রেখে দাও।’

‘চোখের চাউনিটা যে খারাপ। মাঝে মাঝে ভয়ংকর করে তাকায়।’

‘ওকে বলবে সব সময় যেন সানগ্লাস পরে থাকে।’

‘বুক্সিটা খারাপ না। ভাল বলেছিস হিমু। এটা আমার মাথায় আসেনি। কথায় আছে না এক মাথার থেকে দু'মাথা ভাল — আসলেই তাই। এখন আমার সমস্যাটা শোন। খুব মন দিয়ে শুনবি।’

‘খাওয়া শেষ হোক তারপর শুনি . . .’

‘থেতে থেতেই শোন। আমি আবার চুপচাপ থেতে পারি না। ব্যাপারটা কি হয়েছে শোন। তোর খালু খারা যাবার পর বাড়ি ভর্তি হয়ে গেল ফালতু লোকে। অমুক আত্মীয় তমুক আত্মীয়। একেবারে খুঁটি গেড়ে বসেছে। মতলব আর কিছু না — টাকা পয়সা হাতানো। টাটকা মধু পড়ে আছে — পিপড়ার দল চারদিক থেকে এসে পড়েছে। আমি একে একে ঝেঁচিয়ে সব বিদেয় করলাম। বাড়ি খালি করে ফেললাম। চাবিশংস্তা গেটে তালার ব্যবস্থা করলাম। একজনের জায়গায় দুঃজন দারোয়ান রাখলাম। চাবিশ ঘন্টা ডিউটি। কাউকে চুক্তে দেবে না। কেউ যদি চুক্তে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি নেট। আমার যদি কারোর সঙ্গে কথা বলার দরকার হয় আমি নিজেই দেখি করতে যাব। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। লোকজন টেলিফোনে বিরক্ত করে। দিলাম টেলিফোন লাইন কেটে।

এত বড় বাড়িতে আমি ধাকি একা। একটু যে ভয় ভয় লাগে না, তা না। লাগে কিন্তু আত্মীয় স্বজ্ঞনের যত্নপার চেয়ে ভয় পাওয়া ভাল। লক্ষ গুণ ভাল।

তারপর একদিন কি হয়েছে শোন। রাত এগারোটাৰ মত বাজে। খুব দেখি মশা কামড়াচ্ছে। দরজায়, জানালায় নেট আছে তারপরেও এত মশা চুকল কি ভাবে? আমার মেজাজ হয়েছে খারাপ। কারণ আমি আবার মশারির ভেতর ঘুমুতে পারি না। আমার একটা কাজের মেয়ে ছিল রেবা। ওকে বললাম মশারি খাচিয়ে দিতে। ও মশারি খাচিয়ে দিল। মেজাজ টেজাজ খারাপ করে ঘুমুতে গেছি। বাতি নিভিয়ে মশারির কাছে

গেলাম, মশারি তুলে দেখি মশারীর ভিতর ও বসে আছে। তোর খালু। নেংটো হয়ে বসে আছে। গুটিসুটি মেরে বসা। মাথা সুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

আমি চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান। সেই থেকে শুরু। কখনো তাকে দেখি খাটের নিচে। কখনো বাথরুমের বাথটাবে। একদিন পেলাম ডীপ ফ্রীজে।

‘কোথায়, ডীপ ফ্রীজে?’

‘হ্যাঁ। ডীপ ফ্রীজ সব সময় বাবুটি খোলে। সেদিন ফ্রীজে জিনিসপত্র কি আছে দেখাব জন্যে ডালাটা তুললাম — দেখি একেবারে খালি ফ্রীজ, সেখানে ও বসে ঠাণ্ডায় ধরবস্থ করে কাঁপছে। এই হল ব্যাপার, বুঝলি। এরপর থেকে রাতে ঘুমুতে পারি না।’

‘রোজই দেখ?’

‘গ্রাম রোজই দেখি।’

‘আজ দেখেছ?’

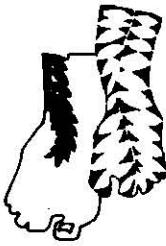
‘এখনো দেখিনি। তবে দেখব তো বটেই। এর মানেটা কি বল তো হিমু? এই অত্যাচারের কারণ কি? ভূত প্রেত বলে সত্যি কিছু আছে? মানুষ মরলে ভূত হয়?’

আমি দেখলাম রেশমা খালা আর কিছু থেতে পারছেন না। মুখ শুকিয়ে গেছে। হাত কাঁপছে। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, হিমু কথা বলছিস না কেন?

‘তুমি একাই উনাকে দেখ না আরে অনেকেই দেখে?’

‘সবাই দেখে। রেবা দেখেছে। দেখে চাকরি-টাকরি ছেড়ে চলে গেছে। আমার সাথে যারা আছে তারাও দেখেছে। এরা কেউ রাতে দোতলায় ওঠে না। তুই রাতটা আমার সঙ্গে থাক। তুইও দেখবি।’

আমি খালার দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই প্রথম বেচারীর জন্যে মায়া লাগছে।



রেশমা খালার 'প্যালেস' এক সপ্তাহ পার করে দিলাম। সমস্যামুক্ত জীবন যাপন। আহর, বাসস্থান নামক দুটি অধান মৌলিক দাবি মিটে গেছে। এই দুটি দাবি মিটলেই বিনোদনের দাবি ওঠে। খালার এখানে বিনোদনের ব্যবস্থা ও প্রচুর আছে। আমার ভালই লাগছে।

টাক দেখলে লোকে রাস্তা ছেড়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু সেই খেলা টাকে করে অমনের আনন্দ অন্য রকম। আমার অবস্থা হয়েছে এরকমই। রেশমা খালার সঙ্গে গল্পগুজব করতে এখন ভালই লাগে। শুধু রাতে একটু সমস্য হয়। রেশমা খালা আমার দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বলেন, আয় আয়, দেখে যা, নিজের চোখে দেখে যা। বসে আছে, খাটে পা দুলিয়ে বসে আছে।

আমি হাই তুলতে তুলতে বলি, থাকুক বসে। তুমিও তার পাশে বসে পা নাচাতে থাকো। এ ছাড়া আর করার কি আছে?

পূরোপুরি নিশ্চিন্ত, নিষ্পঞ্চাট জীবন যাপন সম্ভব না। সব জীবনেই কিছু ঝামেলা থাকবে। কাবাব যতই ভালই হোক, কাবাবের এক কোনায় ছেট হাড়ির টুকরো থাকবেই।

রাতে রেশমা খালার হৈ-চৈ, ছেটাছুটি, চিংকার অগ্রাহ্য করতে পারলে গনি প্যালেস মাসের পর মাস থাকা যায়। তাছাড়া এই বাড়ির বাবুটির সঙ্গে আমার বেশ স্বচ্ছ হয়েছে। নাপিত সম্প্রদায়ের মানুষ খুব বৃদ্ধিমান হয় বলে জনশুভি -- আমাদের বাবুটি সব নাপিতের কান কেটে নেয়ার বুর্কি রাখে। বোকার ভান করে সে দিব্যি আছে।

এক সকালে সে আমার জন্যে বিরাট এক বাটি সুপ বানিয়ে এনে বলল, আপনি একবার আরশোলার সুপ চেয়েছিলেন, বানাতে পারিনি। আজ বানিয়েছি। খেয়ে দেখুন স্যার, আপনার পছন্দ হবে। সঙ্গে মাশরুম আর ব্রকোলি দিয়েছি।

বাটির ঢাকনা খুলে আমার নাড়িভূতি পাক দিয়ে উঠলো। সাদা রঙের সুপ, তিন-চারটা তেলাপোকা ভাসছে। একটা আবার উল্টো হয়ে আছে। তার কিলবিলে পা দেখা যাচ্ছে।

বাবুটি শাস্ত স্বরে বলল, সম-টিস কিছু লাগবে স্যার?

আমি বললাম, কিছুই লাগবে না। তাকে পূরোপুরি হতভয় করে এক চামচ মুখে

দিয়ে বললাম, সুপটা মন্দ হয়নি। তবে আরশোলার পরিমাণ কম হয়েছে।

আমি কোন চীজ সে ধরতে পারেনি। ধরতে পারলে আমার সঙ্গে রাস্তিকা করতে যেত না। আমি তাকে সামনে দাঁড়া করিয়েই পুরো বাটি সুপ খেয়ে বললাম — বেশ ভাল হয়েছে। পরেরবার আরশোলার পরিমাণ বাড়াতে হবে। এটা যেন মনে থাকে।

বাবুটি বিড় বিড় করে বলল, ছি আচ্ছা, স্যার।

রেশমা খালা আমার প্রতি যথেষ্ট মত্তা প্রদর্শন করছেন। সেই মত্তার নির্দর্শন হচ্ছে আমাকে বলেছেন ও হিমু, তোর তো ভিক্কুকের মত হাঁটাহাঁটির স্বত্ত্বা। হাঁটাহাঁটি না করলে পেটের ভাত হজম হয় না। এখন থেকে গাড়ি নিয়ে হাঁটাহাঁটি করবি।

আমি বললাম, সেটা কি রকম?

'পাজেরো নিয়ে বের হবি। যেখানে যেখানে হাঁটতে হচ্ছা করবে ড্রাইভারকে বলবি, গাড়ি নিয়ে যাবে।'

'এটা মন্দ না। গাড়িতে চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল।'

কিছুদিন থেকে আমি পাজেরো নিয়ে হাঁটছি। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছি, এই গাড়িতে বসলেই ছোট ছেট গাড়ি বা বিকশাকে চাপা দেয়ার প্রবল ইচ্ছা হয়। টাক ড্রাইভার কেন অকারণে টেম্পো বা বেবোটেক্সির উপর ট্রাক তুলে দেয় আগে কখনো বুবিনি। এখন বুবতে পারছি। এখন মনে হচ্ছে দোষটা সর্বাংশে ট্রাক ড্রাইভারদের নয়, দোষটা ট্রাকের।

যে বড় সে ছোটকে পিষে ফেলতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক আগতিক নিয়ম। ডারউইন সাহেবের ধারণা 'সারভাইভেল ফর দি ফিটেস্ট' শুধু জীবজগতের জন্যে প্রযোজ্য হবে, বন্ধুজগতের জন্যে প্রযোজ্য হবে না, তা হয় না।

পাজেরো নিয়ে হাঁটতে বেরুবার একটাই সমস্যা — গলিপথে হাঁটা যায় না। রাজপথে হাঁটতে হয়। এরকম রাজপথে হাঁটতে বের হয়েই একদিন ইরার সঙ্গে দেখা। সে বেশ হাত নেড়ে গল্প করতে করতে একটা ছেলের সঙ্গে যাচ্ছে। দূর থেকে দুঃসনকে প্রেমিক-প্রেমিকার মত লাগছে। ছেলেটা সুদর্শন। লম্বা, ফর্সা, কোকড়ানো চুল। কফি কালারের সাটে সুন্দর মানিয়েছে। তার চেহারায় আলগা গাঁজীর্য। সুন্দরী মেয়ে সঙ্গে নিয়ে হাঁটলেই আপনাআপনি ছেলেদের চেহারায় কিছু গাঁজীর্য চলে আসে। তার একটু বেশি এসেছে।

আমি পাজেরো ড্রাইভারকে বললাম, এ যে ছেলেমেয়ে দুটি যাচ্ছে, ঠিক ওদের পেছনে গিয়ে বিকট হর্ন দিন। যেন দুঃসন ছিটকে দুদিকে পড়ে যায়।

ড্রাইভার বিরক্ত হয়ে বলল, তারা যাচ্ছে ফুটপাতে। ফুটপাতে গাড়ি নিয়ে উঠব কিভাবে?

'তাহলে তাদের সাহিতে নিয়ে গিয়েই হর্ন দিন। চেষ্টা করবেন হনটা যথাসম্ভব বিকট করার জন্যে।'

তাই করা হল। হৰ্ন শুনে ছেলেটার হাত থেকে ঝলস্ত সিগারেট পড়ে গেল। ইরা ছেলেটার মত চমকালো না। মেয়েদের ম্বায় ছেলেদের চেয়ে শক্ত হয়। আমি গলা বাড়িয়ে বললাম, এই ইরা, এই? যাচ্ছ কোথায়?

ইরা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। সঙ্গী ছেলেটা হতভয়।

আমি প্রায় অভিমানের মত গলায় বললাম, এই যে তুমি মেসে এসে একবার গল্পগুজ্ব করে গেলে, তারপর তোমার আর কোন খোজ নেই। ব্যাপার কি বল তো? আমি এমন কি অন্যায় করেছি?

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি ছেলেটার চোখ-মূখ পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে। তার প্রেমিকা অন্য একজনের মেসে গল্প করে সময় কাটাচ্ছে এটা সহ্য করা মুশকিল। কোন প্রেমিকই করে না।

আমি হাসি হাসি মুখে বললাম, উঠে এসো ইরা। উঠে এসো। তোমার সঙ্গে এক লক্ষ কথা আছে। আজ সারাদিন গাড়ি করে মূরব আর গল্প করব।

ইরা কঠিন মুখ করে এগিয়ে এল। গাড়ির জানালার কাছে এসে চাপা গলায় বলল, আপনি ভাইভাবে কথা বলছেন কেন?

‘কোনভাবে বলছি?’

‘এমনভাবে বলছেন যেন আপনি আমার দীর্ঘ দিনের পরিচিত। ব্যাপার সে রকম নয়। মুহিব না জানি কি ভাবছে।’

‘মুহিবটা কে? এই ক্যাবলা?’

‘ক্যাবলা বলবেন না, কোনদিন না। কখনো না।’

‘তোমার ক্লোজ ফ্রেন্ড?’

‘ইঞ্জ।’

‘তার ফ্রেন্ডলীপ কর্তৃ গাঢ় সেটা আজ আমরা একটু পরীক্ষা করি। তুমি এক কাজ কর — মুহিবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গাড়িতে উঠে এসো। ওর প্রেমের দৌড়টা পরীক্ষা করা যাক। সে হতভয় হয়ে তাকিয়ে থাকবে, রাগে থরথর করে কাঁপবে। সেটা দেখতে ইটারেন্টিং হবে।’

‘সবার সঙ্গেই আপনি এক ধরনের খেলা খেলেন। আমার সঙ্গে খেলবেন না। এবং আপনি আমাকে আবার তুমি করে বলছেন। এ রকম কথা ছিল না।’

‘আপনি তাহলে গাড়িতে উঠবেন না?’

‘অবশ্যই না। আপনি আমাকে কি ভেবেছেন? পাপেট? সৃতা দিয়ে দাঁধা পাপেট?’

‘গাড়িতে না উঠলে চলে যাই। শুধু শুধু সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। তা ছাড়া মুহিব ছেলেটি কেমন ক্যাবলার মত হা করে আছে। দেখতে খারাপ লাগছে। আপনি বরং ওর কাছে চলে যান। ওকে বলুন হা করে তাকিয়ে না থাকতে। মুখে মাছি ঢুকে যেতে পারে।’

‘এ রকম অশালীন ভঙ্গিতেও আর কোন দিন কথা বলবেন না।’

‘আর কোনদিন আপনার সঙ্গে দেখাই হবে না। কথা বলার তো প্রশ্ন আসছে না।’  
‘দেখা হবে না মানে কি?’

‘দেখা হবে না মানে, দেখা হবে না। মাসখানিকের জন্যে আমি অজ্ঞাতবাসে যাচ্ছি।’  
‘কোথায়?’

‘হয় টেকনাফে, নয় তেতুলিয়ায়।’

‘বাদলদের বাড়িতে আপনাকে যেতে বলেছিলাম, আপনি যাননি। এই বাড়িতে আপনাকে ভয়ংকর দরকার।’

‘দরকার হলেও কিছু করার নেই। আচ্ছা ইরা, আমি বিদেয় হচ্ছি — তুমি কষের কাছে ফিরে যাও।’

ইরা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, আপনি এখন চলে গেলে আব আপনার দেখা পাব না। বাদলের আপনাকে ভয়ংকর দরকার।

‘তাহলে দেরি করে লাভ নেই, উঠে এসো।’

‘এই গাড়িটা কার?’

‘কার আবার? আমার। তুমি দেরি করছ ইরা।’

‘আপনি আসলে চেষ্টা করছেন মুহিবের কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে। কেন বলুন তো?’

‘ঈর্ষা।’

‘ঈর্ষা মানে? আপনি কি আমার প্রেমে পড়েছেন যে ঈর্ষা?’

মুহিব আরেকটা সিগারেট ধরিয়েছে। তার মুখে বিরক্তির গাঢ় রেখা। সে কর্কশ গলায় ডাকল — ইরা, শুনে যাও।

আমি বললাম, যাও, শ্রীকৃষ্ণের ধীশি বেজে উঠেছে।

ইরা দোটানায় পড়ে গেলো। আমি ভাইভাবকে বললাম, চল, যাওয়া যাক।

ভাইভাব হস করে বের হয়ে গেলো। যতটা স্পীডে তার বের হওয়া উচিত তারচেয়েও বেশি স্পীডে বের হল। মনে হচ্ছে সেও খানিকটা অপমানিত বোধ করছে। পাঞ্জেরোর মত বিশাল গাড়ি অগ্রাহ্য করার দৃঃসাহসকে সেই গাড়ির ভাইভাব ক্ষমা করে দেবে, তা হয় না।

‘এখন কোন দিকে যায় স্যার?’

‘দিক টিক না — চলতে থাক।’

দুপুরের দিকে আমি আমার পুরানো মেসে গেলাম। বদরুল সাহেবের বৌজ নেয়া দরকার। চাকরির কিছু হয়েছে কি-না। হবার কোন সম্ভাবনা আমি দেখছি না, তবে বদরুল সাহেবের বিশ্বাস থেকে মনে হচ্ছে, হয়ে যেতেও পারে। মানুষের সবচে বড় শক্তি তার বিশ্বাস।

আনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর বদরুল সাহেব দরজা খুলনেন। তাঁর হাসি-যুশি ভাব

আৰ মেই। চোখ বদে গেছে। এই দুদিনেই মনে হয় শৰীৰ ভেঙে পড়েছে। তঁৰ গোলগাল মুখ কেমন লম্বাটে দেখাচ্ছে।

‘বদুকুল সাহেবেৰ খবৰ কি?’

‘খবৰ বেশি ভাল না, হিমু ভাই।’

‘কেন বলুন তো?’

‘আমাৰ স্ত্ৰীৰ শৰীৱটা খুব খাৰাপ। ছেট মেয়েৰ চিঠি গত পৰশু পেয়েছি। চিঠি পাওয়াৰ পৰ খেকে খেতেও পাৱছি না, দুমুতেও পাৱছি না।’

‘চাকায় পড়ে আছেন কেন? আপনাৰ চলে যাওয়া উচিত না?’

‘ইয়াকুব আগামীকাল বিকেলে দেখা কৰতে বলেছে, এই জন্যেই যেতে পাৱছি না।’

‘শেষ পৰ্যন্ত তাহলে আপনাকে চাকৰি দিছে?’

‘ছি। চাকৱিটাও তো খুব বেশি দৰকাৰ। চাকৰি না পেলে সবাই না খেয়ে মৰব। আমি খুবই গৱিৰ মানুষ, হিমু ভাই। কত শখ ছিল স্ত্ৰী-পুত্ৰ-কন্যা নিয়ে একসঙ্গে থাকব। অধৈরে অভাবে সম্ভব হয় নাই। একবাৰ মালীবাণে একটা বাসা প্ৰায় ভাড়া কৰে ফেলেছিলাম। দুই কুমৰে একটা ফ্ল্যাট। বাৰান্দা আছে। রাস্তাৰ একটা জ্বায়গা আছে। সামনে বড় আমগাছ। ডালে দোলনা বাঁধা। এত পছন্দ হয়েছিল! ভেবেছিলাম কষ্ট কৰে কোনমতে থাকব। এৱা হয় মাসেৰ ভাড়া এ্যাডভান্স চাইল। কোথায় পাব হয় মাসেৰ এ্যাডভান্স, বলুন দেখি?’

‘তা তো বটেই।’

‘হিমু ভাই, ছেট মেয়েৰ চিঠিটা একটু পড়ে দেখেন।’

মাত্ৰ ক্লাস সিঙ্গে পড়ে। কিন্তু ভাই চিঠি পড়লে মনে হয় না। মনে হয় কলেজে পড়া মেয়েৰ চিঠি। দুটা বানান অবশ্য ভুল কৰেছে।

চিঠি পড়লাম।

আমাৰ অতি প্ৰিয় বাবা,

বাবা, মা'ৰ খুব অসুখ কৰেছে। প্ৰথমে বাসায় ছিল, তাৰপৰ পাশেৰ বাড়িৰ মজনু ভাইয়া মা'কে হাসপাতালে ভৰ্তি কৰেছে। ডাক্তাৱাৰা বলেছে ঢাকা নিয়ে যেতে। বাসায় সবাই কানাকাটি কৰেছে।

তুমি কোন টাকা পাঠাও নাই কেন বাবা? মা প্ৰথম ভেবেছিল পোস্টাপিসে টাকা আসেনি। রোজ পোস্টাপিসে ঝোঁজ নিতে যাব। তাৰপৰ মা কোথেকে যেন শুনল তোমাৰ ঢাকৰি চলে গেছে।

বাবা, সত্যি কি তোমাৰ ঢাকৰি চলে গেছে? সবাৰ ঢাকৰি থাকে, তোমাৱটা চলে গেলো কেন? তোমাৰ ঢাকৰি চলে যাবাৰ খবৰ শুনে মা বেশি কানাকাটি কৰেনি, কিন্তু বড় আপা এমন কাঙ্গা কেঁদেছে তুমি বিশ্বাস কৰতে পাৱবে না। বড় আপা কাঁদে আৱ বলে — “আমাৰ এত ভাল বাবা! আমাৰ

এত ভাল বাবা!” আমি বেশি কাঁদিনি, কাৰণ আমি জানি, তুমি খুব একটা ভাল ঢাকৰি পাৰে। কাৰণ আমি নামাজ পড়ে দোয়া কৰেছি। বাবা, আমি নামাজ পড়া শিখিছি। ছেট আপা বলেছে আস্তাহিয়াতু ছাড়া নামাজ হয় না। ঐ দেয়ালটা এখনো মৃখস্থ হয় নাই। এখন মৃখস্থ কৰাব। মৃখস্থ হলে আবাৰ তোমাৰ ঢাকৰিৰ জন্যে দোয়া কৰব।

বাবা, মা'ৰ শৰীৰ খুব খাৰাপ। এত খাৰাপ যে তুমি ঘদি মাকে দেখ চিনতে পাৱবে না। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো বাবা।

ইতি তোমাৰ অতি আদৱেৰ ছেট মেয়ে  
জাহেদা বেগম  
ক্লাস সিঙ্গ  
ৱোল নং ১

‘চিঠি পড়েছেন হিমু ভাই?’

‘ছি।’

‘মেয়েটা পাগলী আছে। চিঠিৰ শেষে সব সময় কোন ক্লাস, রোল নং কত লিখে দেয়। ফাস্ট হয় তো, এই জন্য বোধহয় লিখতে ভাল লাগে।’

‘ভাল লাগাবাই কথা।’

‘দুটা বানান ভুল কৰেছে লক্ষ্য কৰেছেন? ঝোঁজ আৰ মুখস্থ। মুখস্থ দীৰ্ঘ উকাৰ দিয়ে লিখেছে। কাছে থাকি না, কাছে থাকলে যত্থ কৰে পড়াতাম। সন্ধাবেলা নিজেৰ ছেলেমেয়েদেৰ পড়াতে বসাৰ আনন্দেৰ কি কোন তুলনা আছে? তুলনা নেই। সবই কপাল।’

বদুকুল সাহেবেৰ চোখে পানি এসে গেছে। তিনি চোখেৰ পানি মুছছেন। যতই মুছছেন ততই তঁৰ চোখে পানি আসছে।

‘বদুকুল সাহেব !’

‘ছি, হিমু ভাই।’

‘আগামীকাল পাঁচটাৰ সময় আপনাৰ ইয়াকুব সাহেবেৰ কাছে যাবাৰ কথা না?’

‘ছি।’

‘আমি ঠিক চারটা চলিশ মিনিটে এসে আপনাকে নিয়ে যাব। আমিও যাব আপনাৰ সঙ্গে। আপনাৰ বন্ধু আবাৰ আমাকে দেখে রাগ কৰবে না তো?’

‘ছি না, রাগ কৰবে না। রাগ কৰাৰ কি আছে! মে যেমন আমাৰ বন্ধু, আপনিৰ সে রকম আমাৰ বন্ধু। আপনি সঙ্গে থাকলে ভাল লাগবে। ঢাকৰিৰ সংবাদ একসঙ্গে পাব। দুঃখ ভাগাভাগি কৰতে ভাল লাগে না ভাই সাহেব, কিন্তু আমন্দ ভাগাভাগি কৰতে ভাল লাগে।’

‘ঠিক বলেছেন। দুপুৰে কিছু খেয়েছেন?’

‘ছি না।’

‘আসুন, ভাত খেয়ে আসি।’

‘কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না, হিমু ভাই। এম্বিতেই মেয়ের চিঠি পড়ে মনটা খারাপ, তার উপরে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে — মনটা ভেঙে গেছে।’

‘কি ঘটনা?’

‘বলতে লজ্জা পাছি, হিমু ভাই।’

‘লজ্জা পেলে বলার দরকার নেই।’

‘না, আপনার কাছে কেন লজ্জা নেই। আপনি শুনুন — ফার্মগেটে গিয়েছি — হঠাৎ দেখি রশীদ। আবদুর রশীদ। নশ্ব। শুধু কোমরে একটা গামছা। এর-তার কাছে যাচ্ছে আর বলছে — একটা লুঙ্গি কিনে দিতে।’

‘আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে?’

‘হ্যাঁ না। ও যেন আমাকে দেখতে না পায় এই জন্যে পালিয়ে চলে এসেছি। তারপর নিজের একটা লুঙ্গি, একটা শার্ট নিয়ে আবার গেলাম। তাকে পাইনি। মানুষের কি অবস্থা দেখেছেন হিমু ভাই?’

‘হ্যাঁ দেখলাম।’

‘ইয়াকুবের কাছে ওর চাকরির কথা বলব বলে ভাবছি।’

‘আগে নিজেরটা হোক তারপর বলবেন।’

‘রশীদকে দেখে এত মনটা খারাপ হয়েছে।’

‘আপনি তাহলে দুপুরে কিছু খাবেন না?’

‘হ্যাঁ না।’

‘তাহলে আমি উঠি। আগামী কাল চাকরির খবরটা নিয়ে আমরা এক কাজ করব। সরাসরি আপনার দেশের বাড়িতে চলে যাব।’

‘সত্যি যাবেন হিমু ভাই?’

‘যাব।’

‘আপনার ভাবীর শরীরটা খারাপ, আপনাকে যে চারটা ভাল-মন্দ রঁধে খাওয়াবে সে উপায় নেই।’

‘শরীর ঠিক করিয়ে ভাল-মন্দ রাঁধিয়ে খেয়ে তারপর আসব। ভাবী সবচে ভাল রাঁধে কোন জিনিসটা বলুন তো?’

‘গরুর গোশতের একটা রাঙ্গা সে জানে। অপূর্ব! মেথিবাটা দিয়ে রাঁধে। পুরো একদিন সিরকা-আদা-রসুনের রসে মাঝে দুবিয়ে রাখে, তারপর খুব অল্প আঁচে সারাদিন ধরে ছাল হয়। বাইরে থেকে এক ফোটা পানি দেয়া হয় না . . . কি যে অপূর্ব জিনিস ভাই সাহেব।’

‘এ মেধির রাঙ্গাটা ভাবীকে দিয়ে রাঁধতে হবে।’

‘অবশ্যই অবশ্যই। পোনা মাছ যদি পাওয়া যায় তাহলে আপনাকে এমন এক জিনিস খাওয়াবো, এই জীবনে ভুলবেন না। কচি সজনে পাতা বেটে পোনা মাছের মৃদে

রাঁধতে হয়। কেন মসলা না, কিছু না, দুটা কঁচামরিচ, এক কোয়া বন্দুন, একটু পেয়াজ। এই দেখুন বলতে বলতে জিবে পানি এসে গেলো।’

‘জিবে পানি যখন এসে গেছে চলুন, খেয়ে আসি।’

‘হ্যাঁ আচ্ছা, চলুন। আপনি দেশে যাবেন ভাবতেই এত ভাল লাগছে।’

মেস থেকে বেকুবার মুখে ম্যানেজার হায়দার আলী ঝাঁ বললেন, স্যার, আপনি মেসে ছিলেন না, আপনার কাছে এ মেয়েটা দু'বার এসেছিল।

‘ইরা?’

‘হ্যাঁ, ইরা। উনার বাসায় যেতে বলেছে। খুব দরকার।’

‘জানি। আমার সঙ্গে এ মেয়ের দেখা হয়েছে। এ মেয়ে যদি আবার আসে, বলবেন Get lost.’

‘স্যার, কি বলব?’

‘বলবেন Get lost. কঠিন গলায় বলবেন।’

‘হ্যাঁ, আচ্ছা।’

হায়দার আলী ঝাঁ পি঱িচে চা খাচ্ছিল; আবারো সারা শরীরে চা ফেলে দিল। এই মানুষটা আমাকে এত ভয় পায় কেন কে জানে!



রাতের অনিদ্রাজনিত ঝুঁতি, দৃঢ়চিন্তা ও আতঙ্কে ভোরবেলা একটা 'হট খাওয়া' দিয়ে  
রেশমা খালা দূর করে দেন। গোসলের পর তিনি পরচুলাটা মাথায় দেন। খানিকটা  
সাজগোজ করে আমার ঘরে এসে বললেন, কি রে হিমু, জেগেছিস? গুড মর্নিং।

আমিও বলি, গুড মর্নিং খালা।

'চা দিতে বলেছি। হ্যাত-মুখ ধূয়ে আয়।'

'তোমাকে তো আজ দারুণ লাগছে। কপালে টিপ দিয়ে বয়স দশ বছর কমিয়ে  
ফেলেছ। এখন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার বয়স বাহাম।'

খালা অত্যন্ত বিকৃত হয়ে বললেন, আমার বয়স তো আসলেই বাহাম।

'ও সরি!'

'হিমু, তোর ঠাট্টা-ফাজলামি আমার ভাল লাগে না। সাজগোজ সামান্য করি —  
তাতে কি? দুদিন পরে তো মরেই যাব। কবরে গিয়ে তো সাজতে পারব না। কবরে  
তোর তো আর ক্রীম, লিপস্টিক দিয়ে আসবি না।'

'সেটা খাটি কথা।'

'বয়সকালে সাজতে পারিনি। এমন এক লোকের হাতে পড়েছিলাম যার কাছে  
সাজা না—সাজা এক। তাকে একবার ভাল একটা ক্রীম আনতে বলেছিলাম, সে দেশী  
তিক্কত ক্রিম নিয়ে চলে এসেছে। তারপরেও আফসোস — এত নাকি দাম।'

'এখন তো পুরিয়ে নিছ?'

'তা নিছি। আয়, চা খাবি। আজ ইংলিশ ক্রেকফাস্ট।'

'চমৎকার!'

চায়ের টেবিলে রেশমা খালাকে বললাম, খালা, অদ্য শেষ সকাল।

খালা বললেন, তার মানে কি?

'তার মানে হচ্ছে নাশতা খেয়েই আমি ফুটছি।'

'ফুটছি মানে কি?'

'ফুটছি মানে বিদেয় হচ্ছি। লম্বা লম্বা পা ফেলে পগারপার।'

'আশ্রয় কথা! চলে যাবি কেন? এখানে কি তোর কোন অনুবিধি হচ্ছে?'

'কোনই অনুবিধি হচ্ছে না। বরং সুবিধা হচ্ছে। আমার ভুড়ি গাজিয়ে গেছে।

"মেদ-ভুড়ি কি করি"-ওয়ালাদের পুঁজে বের করতে হবে।'

'ঠাট্টা করবি না হিমু। খবর্দার, ঠাট্টা না।'

'আমি মোটেও ঠাট্টা করছি না খালা। চা খেয়েই আমি ফুটব।'

খালা বিশ্বাস নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। চায়ের কাপে চুম্বক দিয়ে  
বললেন, আমার এই ভয়ংকর অবস্থা দেখেও তোর দয়া হচ্ছে না? রাতে এক ফোটা  
পুমুতে পারি না। এ বদমায়েশ লোকটার যত্নগাম মাঝে মাঝে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে  
মরে যেতে ইচ্ছে করে। আর তুই চলে যাবি?

আমি আবাক হয়ে বললাম, খালু সাহেব কি কালও এসেছিল? গতকাল তো তার  
আসার কথা না।

'গতকাল তার আসার কথা না মানে? তুই জ্ঞানলি কি করে তার আসার কথা না?'

'আমার সঙ্গে কথা হয়েছে।'

খালা হতভয় হয়ে বললেন, তোর সঙ্গে কথা হয়েছে?

'হ্যাঁ।'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ করিস না, ঠিকমত বল। তুই দেখেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'আবার হ্যাঁ? আরেকবার হ্যাঁ বললে কেতুপির সব চা মাখায় ঢেলে দেব। কখন দেখা  
হল?'

'কাল রাত নটার দিকে।'

'বলিস কি!'

'তুমি রাতে খাওয়ার জন্যে ডাকলে। আমি ঘর থেকে বেরব। স্যান্ডেল খোঁজার  
জন্যে নিচু হয়ে দেখি, উনি ঘাপটি মেরে খাটের নিচে বসে আছেন।'

'তোর খাটের নিচে ও বসবে কিভাবে? তোর খাটটা হল বজ্জ খাট। বজ্জ খাটের  
আবার নিচ কি?'

'ঠিক নিচ না, বলতে ভুল করেছি। খাটের সাইডে।'

'গায়ে কাপড়—চোপড় ছিল?'

'উহুঁ।'

'তুই দেখে তয় পেলি না?'

'তয় পাব কেন? জীবিত অবস্থায় উনার সঙ্গে আমার ভাল খাতির ছিল। একবার  
হেঁটে হেঁটে সদরঘাটের দিকে যাচ্ছি। তিনি তাঁর প্রাইভেট রিকশায় যাচ্ছিলেন। আমাকে  
দেখে রিকশা থামিয়ে তুলে নিলেন। পথে এক জায়গায় আবের সরবত বিক্রি হচ্ছিল।  
রিকশা থামিয়ে আমরা আবের সরবত খেলাম। আরেকটু এগিয়ে দেবি তাব বিক্রি  
করছে — রিকশা থামিয়ে দুজন ডাব খেলাম। তারপর খালু সাহেব আইসক্রীম  
কিনলেন। খেতে খেতে আমরা তিনজন যাচ্ছিলাম।'

'তিনজন হল কিভাবে?'

‘রিকশাওয়ালাও খাচ্ছিল। তিনজন মিলে রীতিমত এক উৎসব। বুরালে খালা, তখনই বুঝলাম উনি একজন অসাধারণ মানুষ। আয় মহাপুরুষ পর্যায়ের। ব্যবসায়ীরাও মহাপুরুষ হতে পারে কোনদিন ভাবিনি।’

‘তুই এক কথা থেকে আরেক কথায় চলে যাচ্ছিস। আসল কথা বল। খাটের নিচে ও বসেছিল?’

‘খাটের নিচে না, সাইডে।’

‘তারপর?’

‘আমি বললাম, খালু সাহেব, কেমন আছেন?’

‘সে কি বলল?’

‘কিছু বললেন না। মনে হল লজ্জা পেলেন। তখন আমি বেশ রাগ রাগ ভাব নিয়ে বললাম — আপনার মত একটা ভদ্রলোক . . . মেঝেছেলেকে তয় দেখাচ্ছেন। এটা কি ঠিক হচ্ছে? তয় দেখানোর মধ্যেও তো শালীনতা, ভদ্রতা আছে। নেঁটো হয়ে ভয় দেখানো। তাও নিজের শ্রীকে! ছিঃ ছিঃ!’

‘তুই কি সত্যি এইসব বলেছিস?’

‘ইয়া বললাম। উনি আমার কথায় লজ্জা পেলেন খুব। মাথা নিচু করে ফেললেন। আমার তখন মনটা একটু খারাপ হল। আমি বললাম, এসব করছেন কেন?’

‘সে কি বলল?’

‘কথাবার্তা তাঁর খুব পরিষ্কার না। অস্পষ্ট। কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা যায় না। তবু যা বুঝেছি, উনি বললেন — তোর খালাকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে এইসব করছি। শিক্ষা হয়ে গেলে আর করব না।’

বেশমা খালা ফস করে বললেন, শিক্ষা? কিসের শিক্ষা? আমি কি করেছি যে সে আমাকে শিক্ষা দেবে? সারাজীবন যন্ত্রণা করেছে। মরার পরেও যন্ত্রণা দিচ্ছে। আর কিছু না। লোকটা ছিল হাড় বদমাশ।

আমিও খালু সাহেবকে এই কথাই বললাম। শুধু বদমাশটা বললাম না। তখন খালু সাহেব বললেন, তুমি আসল ঘটনা জান না। তোমার খালা আমাকে বিষ খাইয়েছিল।

‘এত বড় মিথ্যা কথা আমার নামে? এত সাহস? ব্যথায় তখন ওর দয় যায়—যায় অবস্থা। আমার মাথার নেই ঠিক — দৌড়ে অব্যু নিয়ে এনে খাওয়ালাম . . .’

খালু বললেন, যেটা খাওয়ানোর কথা সেটা না খাইয়ে ভুলটা খাইয়েছে। পিটে মালিশের অব্যু দুচামচ খাইয়ে দিয়েছে।

‘ইচ্ছা করে তো খাওয়াইনি। ভয়ে আমার মাথা এলোমেলো।’

‘আমিও খালু সাহেবকে তাই বললাম। আমি বললাম — এটা অনিছ্কৃত একটা ভুল। বেশমা খালা মানুষ খুন করার মত মহিলাই না। অতি দয়াপ্রে মহিলা।’

‘এটা শুনে কি বলল?’

‘বিক খিক করে অনেকক্ষণ হাসল। তারপর আমি বললাম, এখনো তোমার প্রতি

খালার গভীর ভালবাসা। তোমার স্মৃতি রক্ষার্থে “গনি মিয়া ইন্সটিউট অব মডার্ন আর্ট” করবে।’

‘শুনে কি বলল?’

‘শুনে বলল, এইসব যদি করে তাহলে লাখি যেরে মাগীর কেমর ভেঙে ফেলব। ভূত হবার পর খালু সাহেবের ভাষার খুবই অবনতি হয়েছে। স্ত্রীকে মাগী বলা জীবিত অবস্থায় উনার জন্যে অকল্পনীয় ছিল।’

বেশমা খালা এখন আর চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন না। স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন। চোখের দৃষ্টি আগের মত না — অন্যরকম। ‘আমি খালু সাহেবকে বললাম, যা হবার হয়েছে। মাফ করে দেন। ক্ষমা যেমন মানবর্ধম, তেমনি ক্ষমা হচ্ছে ভূতধর্ম। উনি এক শর্তে ক্ষমা করতে রাজি হয়েছেন।’

‘শুভটা কি?’

‘শুভটা হচ্ছে — তুমি তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দান-খয়রাত করবে। স্কুল-কলেজে দিবে, এতিমধ্যে করবে, তাঁর দরিদ্র সব আত্মিয়স্বজনদের সাহায্য করবে। তাহলেই তিনি আর তোমাকে বিরক্ত করবেন না।’

‘হিমু!’

‘ছি খালো।’

‘তুই অসম্ভব বুদ্ধিমান। তুই কিছুই দেবিসনি। কারো সঙ্গেই তোর কথা হয়নি। পুরোটা আমাকে বানিয়ে বানিয়ে বলেছিস। অক্ষকারে তিল ছুড়েছিলি — তিল সেগে গেছে। তোর খালু যেমন বোকা ছিল, আমিও ছিলাম বোকা। শুধু ছিলাম না — এখনো আছি। কথা দিয়ে তুই আমাকে প্যাতে ফেলেছিস। তোর ধারণা তোর কথা শুনে তার কোটি কোটি ঢাকা আমি দান-খয়রাত করে নষ্ট করব? রাতে ভূত হয়ে আমাকে তয় দেখায়, তাতে কি হয়েছে? দেখাক মত ইচ্ছা। বদমায়েশের বদমায়েশ।’

‘এখন রাতে তয় দেখাচ্ছেন, তারপর দিনেও দেখাবেন। আমাকে সে রকমই হিটস দিলেন।’

‘বেশি চালাকি করতে যাস না হিমু। তোর চালাকির আমি পরোয়া করি না। ব্যবর্দ্ধার, তোকে যেন আর কোনদিন এই বাড়ির আশেপাশে না দেখি।’

‘আর দেখবে না খালা। এই যে আমি ফুটব, জন্মের মতই ফুটব। খালা শোন, খালু সাহেবের সঙ্গে দীর্ঘ কথাবার্তার যে বর্ণনা আমি দিলাম তার পুরোটাই বানানো, তবে উনাকে আমি কিন্তু দেখেছি।’

‘চুপ থাক হারামজাদা।’

‘বিশ্বাস করুন উনাকে দেখেছি, এবং আপনি যে উনাকে যেরে ফেলেছেন এটা উনি ইশারায় আমাকে বোঝালেন। উনি কোন কথা বলেননি। ভূতদের সন্তুত কথা বলার ক্ষমতা থাকে না।’

‘চুপ হারামজাদা — শুওরের বাচ্চা। চুপ।’

বেশমা খালা ভয়ানক হৈ-চৈ শুরু করলেন। বাবুটি, দারোয়ান, মালী সবাই ছুটে এল। বেশমা খালা বাগে কাপতে কাপতে বললেন, এই চোরটাকে লাখি যেরে বের করে দাও।

বেশমা খালার কর্মচারীরা যজ্ঞামের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। শুধু লাখিটা দিল না। লাখির বদলে এমন গলাধাক্কা দিল যে রাস্তায় উল্টে পড়তে পড়তে কোনমতে রক্ষা পেলাম। খালার বাড়িতে আমার রেস্লিনের একটা ব্যাগ রয়ে গেল। ব্যাগের ভেতর আমার ইহজাগতিক যাবতীয় সম্পদ। দুটা শার্ট, একটা খুব ভাল কাশ্মীরী শাল। শালটা রংপা আমাকে জন্মদিনে দিয়েছিল। আমি হতদরিষ্ট মানুষ হলেও বুকে হাত দিয়ে একটা কথা বলতে পারি — ঢাকা শহরে এমন দায়ী শাল আর কারোরই নেই।

গলাধাক্কার ভেতর যে দিন শুরু হয়েছে সেই দিনের শেষটা কেমন হবে ভাবতেই আতঙ্ক লাগে। বিকেলে বদরুল সাহেবকে নিয়ে ইয়াকুব নামক ইন্ডিপ্রিয়ালিস্টের কাছে যাবার কথা। সেখানে কোন নাটক হবে কে জানে।

রংপার সঙ্গে আজ সকালের মধ্যেই আমার দেখা করা দরকার। একমাত্র সেই পারে একদিনের নোটিশে বদরুল সাহেবের জন্যে চাকরির ব্যবস্থা করতে। টেলিফোনে রংপার সঙ্গে কথা বলব — না সরাসরি তার বাড়িতে উপস্থিত হব, বুঝতে পারছি না। বাদলদের বাড়িতেও একবার যাওয়া দরকার। বাদল এমন কি করছে যে ইয়াকে বার বার আমার সৌজে যেতে হচ্ছে? রংপাকে বাদলদের বাসা দেকেও টেলিফোন করা যায়।

দরজা খুলে দিল ইয়া। আমি অসম্ভব ভদ্র গলায় বললাম, কেমন আছেন?

ইয়া কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। দিন শুরু হয়েছে গলাধাক্কায়, কাজেই যার সঙ্গেই দেখা হবে সেই কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকবে এতে আর আকর্ষণ্য হ্যাব কি আছে? আমাকে যে লাঠি দিয়ে মারছে না এই আমার তিনপুরুমের ভাগ্য।

‘বাদল আছে না-কি?’

‘আছে।’

‘ফুপা—ফুপু আছেন?’

‘সবাই আছেন। আপনি বসুন।’

ইয়া কঠিন মুখে ভেতরে চলে গেল।

এমনভাবে গেল মেন বন্দুক আনতে গেছে। ফুপা অফিসে যাবার প্রস্তুতি নিছিলেন, প্যান্ট পরেছেন, বোতাম লাগানো হয়নি, প্যান্টের বেল্ট লাগানো হয়নি। এই অবস্থাতেই চলে এলেন। আগুন আগুন চোখে তাকালেন। স্বামীর পেছনে পেছনে স্ত্রী — তার চোখেও আগুন।

আমি হাসিমুখে বললাম, তারপর, খবর কি আপনাদের? সব ভাল?

ফুপা ক্রুক্ক গর্জন করলেন। গর্জন শুনেই মনে হচ্ছে খবর ভাল না।

‘আপনাদের আর কারো গলায় কঠিন-কঠিন বিধেছে?’

ফুপা এবারে ঝংকার দিলেন, ইয়ারাকি করছিস? দাঁত বের করে ইয়ারাকি?

আমার অপরাধ কি বুঝতে পারছি না। তবে গুরুতর কোন অপরাধ যে করে ফেলেছি তা বোধা যাচ্ছে। ইয়াও এসেছে। তার চোখে আগে চশমা দেখিনি, এখন দেখি চশমা পরা।

ফুপু বললেন, তোকে যে এতবার খবর দেয়া হচ্ছে আসার জন্যে গায়ে লাগছে না? তোকে কি হাতি পাঠিয়ে আনাতে হবে?

‘এলাম তো।’

‘এসে তো উঞ্জাৰ করে ফেলেছিস।’

‘ব্যাপারটা কি খোলাসা করে বলুন।’

কেউ কিছু বলছে না। ভাবটা এৱকম — আমি বলব না। অন্য কেউ বলুক। আমি ইয়াৰ দিকে তাকিয়ে আচুরে গলায় বললাম, ইয়া, চা খাব।

ইয়া এমন ভাব করল যেন অত্যন্ত অপমানসূচক কোন কথা তাকে বলা হচ্ছে।

আমি বললাম, তুমি যদি চা বানাতে না পার তাহলে লুৎফাৰ মাকে বল। ভাল কথা, লুৎফা মেয়েটা কোথায়?

এবারো জবাব নেই। ফুপা পেটের বোতাম লাগাছেন বলে অশিদ্ধিতে আমার দিকে তাকাতে পারছেন না। তাকে বোতামের দিকে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে, তবে ফুপু তার দৃষ্টি দিয়ে স্বামীর অভাব পূরণ করে দিচ্ছেন। তার চোখে ডাবল আগুন। কথা বলল ইয়া। কাটা কাটা ধরনের কথা। তার কাছ থেকেই জানা গেল লুৎফা মেয়েটা চোরের হস্ত। এসেই চুরি শুরু করেছে। বিছানার তল থেকে টাকা নিছে, মালিব্যাগ খুলে নিছে, সবশেষে যা করেছে তা অবিশ্বাস্য। ফুপুর কানের দূল চুরি করে নিজের পায়জ্ঞামার ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছে। লাফালাফি করছিল, হাঁট পায়জ্ঞামার ভাঁজ থেকে দূল বের হয়ে এলো। তৎক্ষণাত্মে মা-মেয়ে দুঃজনকে বিদায় করে দেয়া হচ্ছে। কাজেই বাড়িতে এই মুহূর্তে কোন কাজের মেয়ে নেই। আগের যত চাইলেই চা পাওয়া যাবে না।

বাদলের প্রসঙ্গে যা জানা গেল তা কানের দূলের চেয়েও ভয়াবহ। সে গত দশদিন হল ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে না। দরজা বন্ধ করে ধ্যান করছে।

আমি শুধু ভঙ্গিতে ফুপার দিকে তাকিয়ে বললাম, ধ্যান করা তো গুরুতর অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না। আপনারা এত আপসেট কেন?

ফুপা বললেন, মুগড় দিয়ে এমন বাড়ি দেব যে সব কটা দাঁত খুলে চলে আসবে। ধ্যান করা শৈক্ষায়। সাহস করবড়ি! যা, ধ্যান কিভাবে করছে নিজের চোখে দেখে আয়।

‘কিভাবে ধ্যান করছে?’

‘কাপড়-জামা খুলে ধ্যান করছে। হারামজাদা! দশ দিন ধরে বিছানার উপর নেংটো হয়ে বসে আছে।’

‘সে কি !’

‘আবার বলে সে-কি ? তুই-ই না-কি বলেছিস নেঁটো হয়ে ধ্যান করতে হয়। ধ্যান করা কাকে বলে তোকে আমি শেখাব। বন্দুক দিয়ে আজ তোকে আমি গুলি করে মেরে ফেলব। গুরুদেব এসেছে — ধ্যান শেখায় !’

ফুপু বললেন, তুমি এত হৈ-চৈ করো না। তোমার প্রেসারের সমস্যা আছে। তুমি অফিসে চলে যাও। যা বলার আমি বলছি।

‘অফিস চূলাই যাব। আমি হিমুকে সত্তি সত্তি গুলি করে মেরে তারপর অফিসে যাব। গুরুদেবগিরি বের করে দেব।’

ইরা বলল, হৈ-চৈ করে তো লাভ কিছু হবে না। ব্যাপারটা ভাল মীমাংসা হওয়া দরকার। উনি বাদলকে বুঝিয়ে বলবেন যেন সে এসব না করে। তারপর এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন। আর কখনো এ বাড়িতে আসবেন না। এবং বাদলের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ রাখবেন না।

ফুপু তীব্র গলায় বললেন, যোগাযোগ রাখবে কিভাবে ? হারামজাদাকে আমি দেশছাড়া করবো না ! এ ক্রিমিন্যাল ! এ পেশ্ট !

পরিষ্ঠিতি ঠাণ্ডা হতে আধ ঘন্টার মত লাগল। এর মধ্যে ইরা চা বানিয়ে আনল। ফুপুর অফিসের গাড়ি এসেছিল — তিনি আমাকে গুলি করা আপাতত স্থগিত রেখে অফিসে চলে গেলেন। ফুপু ফোস ফোস করে কাঁদতে বসলেন। ফোসফোসানির মাঝখানে যা বললেন তা হচ্ছে — এত বড় ধামড়া ছেলে নেঁটো হয়ে বসে আছে ! কি লজ্জার কথা ! তাকে তার ঘরে খাবার দিয়ে আসতে হয়। ভাগিস বেশি লোকজন জানে না। জানলে নির্বাণ পাবলা মেটাল হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে আসতো।

ইরা আমার দিকে তাকিয়ে মোটামুটি শাস্তি ভঙ্গিতেই বলল, আপনি চা খেয়ে দয়া করে বাদলের কাছে থান। তাকে বুঝিয়ে বলুন। সে বাস্তব এবং কল্পনা গুলিয়ে ফেলেছে।

আমি চাপ্পের কাপ হাতে বাদলের ঘরে গিয়ে টোকা দিলাম। বাদল আনন্দিত গলায় বলল, হিমু ভাই ?

‘ই !’

‘আমি টোকা শুনেই টের পেয়েছি। তুমি ছাড়া এরকম করে কেউ টোকা দেয় না।’

‘তুই ধ্যান করছিস না-কি ?’

‘ই ! হচ্ছে না !’

‘দরজা খেল দেবি।’

বাদল দরজা খুলল। সে যে নগ্ন হয়েই বসেছিল সেটা বোধ যাচ্ছে। তার কোমরে তোয়ালে জড়ানো। মুখ আনন্দে ঝলমল করছে।

‘তোমাকে দেখে এত আনন্দ হচ্ছে হিমু ভাই ! মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলব।’

‘তুই মনে হচ্ছে নাগা সম্ম্যাসীর পথ ধরে ফেলেছিস !’

‘তুমি একবার বলেছিলে না — সব ত্যাগ করতে হবে। আসল জিনিস পেতে হলে সর্বত্যাগী হতে হবে। পোশাক-পরিচ্ছদও ত্যাগ করতে হবে।’

‘বলেছিলাম না-কি ?’

‘হ্যাঁ বলেছিলে !’

‘ঐ স্টেজে তো ঘপ করে যাওয়া যায় না। ধাপে ধাপে উঠতে হয়। ব্যাপারটা হল সিড়ির মত। লম্বা সিডি। সিডির একেকটা ধাপ পার হয়ে উঠতে হয়। ফস করে জামা-কাপড় খুলে নেঁটো হওয়াটা কোন কাজের ব্যাপার না !’

‘শাট-প্যান্ট পরে ফেলব ?’

‘অবশ্যই পরে ফেলবি। ইউনিভার্সিটি খোলা না ?’

‘হ্যাঁ !’

‘আজ ক্লাস আছে ?’

‘আছে !’

‘জ্ঞামা-কাপড় পরে ক্লাসে যা। সাধনার প্রক্রিয়া শিখিয়ে দেব। আন্ত আন্তে উপরে উঠতে হবে। কাউকে কিছু বুঝতে দেয়া যাবে না। তুই নেঁটো হয়ে বসে আছিস — আর এদিকে বাড়িতে কানাকাটি পড়ে গেছে। এইভাবে সাধনা হয় ?’

‘ঠিকই বলেছি। ইউনিভার্সিটিতে যেতে বলছ ?’

‘অবশ্যই !’

‘আমার ইউনিভার্সিটিতে যেতে একেবারেই ইচ্ছা করে না।’

‘কি ইচ্ছা করে ?’

‘সারাক্ষণ ইচ্ছা করে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকি। তোমার সঙ্গে পথে পথে হাঁটি।’

‘পাশাপাশি দু’ভাবে থাকা যায়। স্কুলভাবে থাকা যায়। এই যেমন তুই আর আমি এখন পাশাপাশি বসে আছি। আবার সৃষ্টিভাবে — চেতনার ভেতরও থাকা যায়। তুই যেই ভাবিব আমার সঙ্গে আছিস, অমি তুই আমার পাশে চলে এসেছিস। সাধারণ মানুষ স্কুল অথবাই জীবনকে দেখে। এতেই তারা সম্ভব। তুই নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ হতে চাস না ?’

‘না !’

‘ভেরী গুড়। যা, ইউনিভার্সিটিতে চলে যা।’

‘আচ্ছা যাচ্ছি। হিমু ভাই, তুমি কি আমার একটা রিকোয়েস্ট রাখবে ? জাস্ট ওয়ান !’

‘তোর একটা না, এক লক্ষ রিকোয়েস্ট রাখব। বলে ফেল !’

‘ইরা যেয়েটাকে একটা শিক্ষা দেবে ? কঠিন একটা শিক্ষা !’

‘সে কি করেছে ?’

‘তোমাকে নিয়ে শুধু হাস্যান্বিত করে। রাগে আমার গা জলে যায় !’

‘সামান্য ব্যাপারে গা জললে হবে কেন ?’

‘আমার কাছে সামান্য না। কেউ তোমাকে কিছু বললে অমার মাথা খারাপের মত হয়ে যায়। হিমু ভাই, তুমি ইরাকে একটা শিক্ষা দাও। ওকে শিক্ষা দিতেই হবে।’

‘কি শিক্ষা দেব?’

‘ওকেও তুমি হিমু বালিয়ে দাও। মহিলা হিমু, যেন সে হলুদ পাঞ্জাবি পরে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটে।’

‘মেয়েমানুষ হয়ে রাত-বিচাতে রাস্তায় হাঁটবে! এটা ঠিক হবে না। তাজড়া এমন একজন ভাল ছাত্রী।’

‘বেশ, তাহলে তুমি তাকে এক রাতের জন্যে হিমু বালিয়ে দাও। জাস্ট ফর ওয়ান নাইট।’

‘দেবি।’

‘না, দেখাদেবি না। তোমাকে বানাতেই হবে। তুমি ইচ্ছা করলেই হবে।’

ফুপু এবং ইরার বিশ্বিত চোখের সামনে দিয়ে বাদল কাপড়-চোগড় পরে ইউনিভার্সিটিতে চলে গেল।

ইরা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি যা করেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ। এখন দয়া করে এ বাড়িতে আর আসবেন না।

আমি বললাম, ছি আচ্ছ। শুধু একটা টেলিফোন করব। টেলিফোন করে জন্মের মত চলে যাব।

ইরা বলল, যদি সম্ভব হয় আপনি দয়া করে নিজেকে বদলাবার চেষ্টা করবেন। আপনাকে আমি কোন উপদেশ দিতে চাই না। অপ্রাপ্তে উপদেশ দেয়ার অভ্যাস আমার নেই। তার পরেও একটা কথা না বলে পারছি না —হলুদ পাঞ্জাবি পরে রাস্তায় হাঁটলেই প্রক্রিয়াকে জানা যায় না। প্রক্রিয়াকে জানার পথ হল বিজ্ঞান। বুঝতে পারছেন?

‘পারছি।’

‘পারলে ভাল। না পারলেও ক্ষতি নেই।’

ফুপু বললেন, ওর সঙ্গে কথা বলিস না ইরা। টেলিফোনটা এনে দে। টেলিফোন করে বিদেয় হোক।

ইরা টেলিফোন এনে দিল।

‘হ্যালো রূপা! আমি হিমু।’

‘বুঝতে পারছি।’

‘কেমন আছ, রূপা?’

‘আমি কেমন আছি সেটা জানার জন্যে তুমি আমাকে টেলিফোন করোনি। তোমার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। সেটা বলে ফেল।’

‘রাগ করছ কেন?’

‘রাগ করছি না। তোমার উপর রাগ করা অর্থহীন। যে রাগ বোঝে না তার উপর রাগ করে লাভ কি?’

‘রাগ হচ্ছে মানব চরিত্রের অঙ্গকার বিষয়ের একটি। রাগ না বোঝাটা তো ভাল।’

‘যে অঙ্গকার বোঝে না, সে আলোও ধরতে পারে না।’

‘রূপা, তোমার লজিকের কাছে সার্বভাব করছি।’

‘কি জন্যে টেলিফোন করছ বল।’

‘আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দাও রূপা। এমন একটা চাকরি যেন সন্তুষ্টাবে খেয়ে-পরে ঢাকা শহরে ছেটাখাট একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকা যায়। জোগাড় করে দিতে পারবে?’

‘এমন কি কখনো হয়েছে যে তুমি আমার কাছে কিছু চেয়েছ আর আমি বলেছি — না?’

‘হ্যালি।’

‘এবারো হবে না।’

‘আজ দিনের ভেতর চাকরিটা জোগাড় করে দিতে হবে।’

‘সেটা কি করে সম্ভব?’

‘তোমার জন্যে কোন কিছুই অসম্ভব না।’

‘চাকরিটা কার জন্যে?’

‘আমার এক বক্তুর জন্যে। অতি প্রিয় একজনের জন্যে।’

‘নাম বল। এপ্রেসটেমেট লেটারে তার নাম তো লাগবে।’

‘লিখো — বদরুল আলম। চাকরিটা কিন্তু আজকের মধ্যেই জোগাড় করতে হবে।’

‘চেষ্টা করব। এপ্রেসটেমেট লেটার কি তুমি এসে নিয়ে যাবে?’

‘হ্যাঁ, আমি এসে নিয়ে যাব।’

‘তুমি কোথেকে টেলিফোন করছ? যদি বলতে তোমার কোন আপত্তি না থাকে।’

‘আমি বাদলদের বাসা থেকে টেলিফোন করছি। এই নাম্বার তোমার কাছে আছে। এই নাম্বারে টেলিফোন করে আমাকে পাবে না। তারা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।’

‘সবাই তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়?’

‘হ্যাঁ দেয়। এই ভয়েই আমি তোমার কাছে যাই না। কাছে গেলে তুমিও হয়ত বের করে দেবে। রূপা, আমি টেলিফোন রাখি?’

‘না, আরেকটু কথা বল। পীঁজ, পীঁজ।’

‘কি বলব?’

‘যা ইচ্ছা বল। এমন কিছু বল যেন . . .’

‘যেন কি?’

‘না, থাক।’

আমার আগেই রাপা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। আমি ঝুপুর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ইরা বলল, আপনাকে অনেক কঠিন কথা বলেছি — আপনি কিছু মনে করবেন না।

আমি বললাম, আমি কিছু মনে করিন। আমি নানানভাবে আপনাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করেছি। আপনিও কিছু মনে করবেন না।

আমার ক্ষীপ আশা ছিল, মেয়েটা হয়ত বাড়ির গেট পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দেবে। সে এল না। আশ্চর্য কঠিন এক মেয়ে!

আমি এবং বদরুল সাহেব পাশাপাশি বসে আছি। ইয়াকুব আলি আমাদের সামনেই আছেন। আমাদের মাঝখানে বিরাট এক সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলে দুটা টেলিফোন। একটা শাদা, একটা লাল। ইয়াকুব আলি সাহেব রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন। তিনি অসম্ভব ব্যস্ত। আমরা বসে থাকতে থাকতে তিন-চারটা টেলিফোন করলেন। তাঁর টেলিফোন করার ধরনটা বেশ মজার। হির হয়ে কথা বলতে পারেন না। রিভলভিং চেয়ারে পাক খেতে খেতে কথা বললেন। বদরুল সাহেব খুব উস্তুস করছেন। আমি চূপচাপ বসে আছি। ইয়াকুব আলি এক ফাঁকে আমাদের দিকে একটু তাকাতেই বদরুল সাহেব বললেন, ইয়াকুব, ইনি হচ্ছেন আমার ফ্রেন্ড, হিমু সাহেব, উনাকে সাথে করে এনেছি।

ইয়াকুব আলি আমার দিকে তাকিয়ে মধুর ভঙ্গিতে হেসে বললেন, চা চলবে? বলেই ইন্টারকমে কাকে খুব ধমকাতে লাগলেন।

আমরা ধমকপর্ব শেষ হবার জন্যে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম। এক সময় ধমকপর্ব শেষ হল। ইয়াকুব আলি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, এ কি, এখনো চা দেয়নি? বলেই কর্কশ শব্দে বেল বাজাতে লাগলেন। কিংবা কে জানে বেল হয়ত মধুর শব্দেই বাজল, তবে আমার কানে কর্কশ লাগলো।

বদরুল সাহেব বললেন, চা লাগবে না ইয়াকুব।

‘অবশ্যই চা লাগবে। তুমি তোমার বন্ধু নিয়ে এসেছ। ফার্স্ট মিটিং, চা লাগবে না মানে? তারপর বল কি ব্যাপার?’

বদরুল অস্বস্তির সঙ্গে বলল, তুমি আজ আসতে বলেছিলে।

‘ও আছা, আজকে আসতে বলেছিলাম?’

‘আমার একটা চাকরির ব্যাপারে। তুমি বলেছিলে ব্যবস্থা করবে।’

ইয়াকুব আলি হাসিমুরে বলল, বলেছি যখন তখন অবশ্যই করব। স্কুল-জীবনের বন্ধুর সামান্য উপকার করব না তা তো হয় না। বায়োডাটা তো দিয়ে গিয়েছ?

‘হ্যা। দু'বার দিয়েছি।’

‘আমি দেখেছি। দেখ বদরুল, আপাতত কিছু করা যাচ্ছে না। নো অপেনিং। যে

সব অপেনিং আছে তোমাকে তা দেয়া যায় না। তুমি নিশ্চয়ই পিয়নের চাকরি করবে না। হা হা হা।’

বদরুল সাহেব ক্ষীপ স্বরে বললেন, তুমি আজকের কথা বলেছিলে। আমার অবস্থা খুবই ভয়াবহ।

ইয়াকুব দার্শনিক ভাব ধরে ফেলে বলল, অবস্থা তো শুধু তোমার একার ভয়াবহ না, পুরো জাতির অবস্থাই ভয়াবহ। বিজনেস বলতে কিছু নেই। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান লসে রান করছে। বাইরে থেকে সেটা বোঝা যায় না।

‘ইয়াকুব, আমি তোমার উপর ভরসা করে এসেছিলাম . . .’

‘ভরসা নিশ্চয়ই করবে। ভরসা করবে না কেন? আমি কি করব তোমাকে বলি — আমি আমার বিজনেস কসমেটিক্স লাইনে এক্সপান্ড করছি। আমি মনে মনে ডিসাইড করে রেখেছি — তোমাকে সেখানে ম্যানেজারিয়েল একটা পোস্ট দেব।’

‘সেটা করবে?’

‘একটু সময় নেবে। যাত্র জমি কেনা হয়েছে। লোনের জন্যে এপ্লাই করেছি। বিদেশী কোন ফার্মের সঙ্গে কোলাবরেশানে যাব। ফ্যাট্রেই তৈরি হবে — তারপর কাজ। তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। সবুরে মেওয়া ফলে। এটা মনে রাখবে?’

বদরুল সাহেবের হতভয় মুখ দেবে আমার নিজেরই মায়া লাগছে। আহা বেচারা! সে বোধহয় জীবনে এত অবাক হয়নি। এসি বসানো ঠাণ্ডা ঘরেও ঘামছে।

চা চলে এসেছে। ইয়াকুব সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সিগারেট কি চলে নাকি ভাই? তিনি আমাদের দিকে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন। আমি সিগারেট নিতে নিতে বললাম, বদরুল সাহেবকে চাকরিটার জন্যে কৃতদিন অপেক্ষা করতে হবে?

ইয়াকুব সাহেব সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন — এগজ্যান্ট বলা মুশকিল। তিন-চার বছর তো বটেই। বেশি লাগতে পারে।

আমি সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিলাম। চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। হাসিমুরে বললাম, ভাই শুন, চাকরি আপনার পক্ষে দেয়া সম্ভব না এই কথাটা সরাসরি আপনার বক্সকে বলে দিচ্ছেন না কেন? বলতে অসুবিধা কি? চক্ষুলজ্জা হচ্ছে? আপনার যত মানুষের তো চক্ষুলজ্জা থাকার কথা না।

ইয়াকুব আলি চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। ঠাণ্ডা মাথায় আমাকে বোঝার চেষ্টা করছেন। আমার ক্ষমতা যাচাইয়ের একটা চেষ্টাও আছে।

বদরুল সাহেব বললেন, হিমু ভাই, চলুন যাই।

আমি বললাম, চা-টা ভাল হয়েছে, শেষ করে তারপর যাই।

ইয়াকুব আলি এখনো তাকিয়ে আছেন। তাঁর হাত টেলিফোনের উপর। আমি তাঁর দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললাম, আপনি কি আমাকে ভয় পাচ্ছেন? ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি নিরীহ একজন মানুষ। আমি যা করতে পারি তা হচ্ছে — আপনার মুখ

খু-খু ফেলতে পারি। এতে আপনার কিছু হবে না। কারণ প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ আপনার মুখে অদৃশ্য খু-খু ফেলছে। আপনি এতে অভ্যস্ত। খু-খু না ফেললেই বরং আপনি অবাক হবেন।

বদরুল সাহেব হাত থেয়ে আমাকে টেনে তুলে ফেললেন। চাপা গলায় বললেন, হিমু ভাই, কি পাগলামি করছেন?

ইয়াকুব সাহেব তাকিয়ে আছেন। রাগে তাঁর হাত কাঁপছে। সজ্জবত কি করবেন সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে শাস্তি গলায় বললাম, ভাই, আপনি আমাকে ভাল করে চিনে রাখুন। আমার নাম হিমু। আমি কাউকে সহজে ছেড়ে দেই না। আপনাকেও ছাড়ব না।

বদরুল সাহেব আমাকে টেনে ঘর থেকে বের করে ফেললেন।

সিড়ি দিয়ে নামার সময় আমি বললাম, বদরুল সাহেব, আপনি মেসে চলে যান। আমি একটা কাজ সেবে মেসে আসছি। তারপর দুঃখে একসঙ্গে আপনার দেশে রওনা হয়ে যাব।

‘আমার সঙ্গে তো টাকাপয়সা কিছুই নাই?’

‘একটা ব্যবস্থা হবেই। আপনার কি মেসে ফিরে যাবার মত রিকশা ভাড়া আছে?’

‘ন্যু না।’

‘আমার কাছেও নেই। পকেট-নেই পাঞ্জাবি আজও পরে চলে এসেছি। আপনি হেঁটে হেঁটে চলে যান। চিটাগাংথের রাতের ট্রেন কটায়?’

‘সাড়ে দশটায়।’

‘রাত দশটার আগে আমি অবশ্যই পৌছে যাব।’

বদরুল সাহেব পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, কি ইচ্ছা করছে জানেন হিমু ভাই? ইচ্ছা করছে একটা চলন্ত ট্রাকের সামনে লাফ দিয়ে পড়ে যাই।

‘ট্রাকের সামনে লাফ দিয়ে পড়তে হবে না। আপনি মেসে চলে যান, আমি আসছি।’

‘হিমু ভাই, আমার কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না।’

আমি লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোক সত্য হাঁটিতে পারছেন না। পা কাঁপছে। মাতালের মত পা ফেলছেন।

আমি বললাম, চলুন, আপনাকে মেসে পৌছে দিয়ে তারপর যাই, আমার কাজটা সেরে আসি। হাত ধরুন তো দেবি।

‘দেশে গিয়ে আমি আমার শ্রীকে কি বলব? মেয়েগুলিকে কি বলব?’

‘কিছু বলতে হবে না। এদের জড়িয়ে থরবেন। এতেই তারা খুশি হবে। ভাই, চোখ মুছুন তো।’

আমি বদরুল সাহেবকে মেনে নামিয়ে দিয়ে গেলাম রূপার কাছে। আমি নিশ্চিত

সে একটা ব্যবস্থা করে রেখেছে। আমি তার হাত থেকে এপফেটেমেট লেটারটা নেব। হাজারখানিক টাকা নেব। কিছু মিষ্টি কিনব। বদরুল সাহেবের ছেট মেয়েটার জন্যে একটা বাংলা ডিকশনারি কিনব। মেয়েটা বড় বানান ভুল করে। ‘মুখস্থ’-র মত সহজ বানান ভুল করলে চলবে কেন? এইসব উপহার নিয়ে রাতের ট্রেনে রওনা হব বস্তুর বাড়িতে। বস্তু-পত্রীর মেঝি দিয়ে রাঁধা মাংস খেতে হবে। মাছের পোনা পাওয়া গেলে সজনে পাতা এবং পোনার বিশেষ প্রিপারেশন।

রূপাকে বাড়িতে পেলাম না। সে কোথায় কেউ বলতে পারল না। কখন ফিরবে তাও কেউ জানে না। দুপুরে বেরিয়েছে, আর আসেনি।

রাত নটা পর্যন্ত আমি রূপাদের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। বদরুল সাহেব অপেক্ষা করে থাকবেন। তাঁর শ্রীর কাছে তাঁকে পৌছানো দরকার। সঙ্গে একটা পয়সা নেই। ফিরে গেলাম মেসে। কোন একটা ব্যবস্থা কি হবে না?

মেসের ম্যানেজার আমাকে আসতে দেখে ছুটে এল। তার ছুটে আসার ভঙ্গই বলে দিচ্ছে বিশেষ কিছু ঘটেছে। সেই বিশেষ কিছুটা কি? দুঃসংবাদ না। সুসংবাদ? কুপা কি মেসে আমার জন্যে এপফেটেমেট লেটার হাতে অপেক্ষা করছে, না-কি বদরুল আলয় ভয়ংকর কোন কাণ্ড করে বসেছেন? সিলিং ফ্যানে ঝুলে পড়ছেন?

ম্যানেজার হড়বড় করে বলল, স্যার, আপনি মেডিকেল কলেজে চলে যান!

‘কেন?’

‘বদরুল সাহেবের অবস্থা খুবই খারাপ।’

‘কি হয়েছে?’

চূপচাপ বসেছিলেন। তারপর খুব ঘামা শুরু করলেন। কয়েকবার আপনার নাম ধরে ডাকলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। আমরা দৌড়াদৌড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। এস্বুলেস পাওয়া যায় না, কিছু পাওয়া যায় না। রিকশায় করে নিতে হয়েছে হাত-পা একেবারে ঠাণ্ডা।

আমি হাসপাতালের সিডিতে চূপচাপ বসে আছি। রূপা তার কথা রেখেছে। এপফেটেমেট লেটার পাঠিয়েছে। আমাকে না পেয়ে ইবার হাতে দিয়ে এসেছে। ইবার সেই চিঠি নিয়ে প্রথমে গেছে আমার মেসে। সেখানে সব খবর শুনে একাই রাত এগারটার দিকে এসেছে হাসপাতালে।

বদরুল সাহেবের জন্যে খুব ভাল একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছে রূপা। আট হাজার টাকার মত বেতন। কোয়ার্টার আছে। বেতনের সাত পাসেন্টি কেটে রাখবে কোয়ার্টারের জন্যে। রাত বারটার দিকে বদরুল সাহেবের অবস্থা কি খোজ নিতে গেলাম। ইবারও এল আমার সঙ্গে। ডাক্তার সাহেব বললেন, অবস্থা ভাল না। জ্বান ফিরেনি।

‘জ্ঞান ফেরার সম্ভাবনা কি আছে?’

‘ফিফটি-ফিফটি চাপ্স।’

আমি বললাম, ডাঙ্গার সাহেব, এটা একটা এপয়েন্টমেন্ট লেটার। আপনার কাছে  
রাখুন। যদি জ্ঞান ফিরে উনার হাতে দেবেন। যদি জ্ঞান না ফিরে ছিড়ে কূচি কূচি করে  
ফেলবেন।

আমি হাসপাতাল থেকে বের হচ্ছি। এখন কাঁটায় কাঁটায় রাত বারটা — জিরো  
আওয়ার। আমার রাস্তায় নেমে পড়ার সময়। ইয়া বলল, কোথায় যাচ্ছেন?

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, কোথাও না। রাস্তায় রাস্তায় হাঁটবো।

‘আপনার বস্তুর পাশে থাকবেন না?’

‘না।’

ইয়া নিচু গলায় বলল, হিমু ভাই, আমি কি আপনার সঙ্গে হাঁটতে পারি? শুধু  
একটা রাতের জন্যে?

আমি বললাম, অবশ্যই পার।  
ইয়া অস্পষ্ট স্বরে বলল, আপনাকে যদি বলি আমার হাত ধরতে, আপনি রাগ  
করবেন?

আমি শান্ত গলায় বললাম, আমি রাগ করব না। কিন্তু ইয়া, আমি তোমার হাত  
ধরব না।

হিমুরা কখনো কারো হাত ধরে না।

---